ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

কার্যকর নির্বাচন কমিশনঃ
অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

কার্যকর নির্বাচন কমিশন: অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
সাধন কুমার দাস, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা সহযোগী
রবিউল ইসলাম, *অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, **রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি***

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য রবিউল ইসলাম ও শাম্মী লায়লা ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞতা। প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার জুলিয়েট রোজেটি, শাম্মী লায়লা ইসলাম, অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফাতেমা আফরোজ, এবং প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্যের জন্য রুমানা শারমিনসহ অন্যান্য সহকর্মীদের অশেষ ধন্যবাদ। এছাড়াও সকল উত্তরদাতার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ *v*

অধ্যায় এক

ভূমিকা **১**

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা ১

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ২

১.২ গবেষণা পদ্ধতি ২

১.৩ গবেষণার সময় ৩

১.৪ প্রতিবেদনের কাঠামো ৩

অধ্যায় দুই

নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত আইনি সংস্কার **৪**

২.১ নির্বাচন সংক্রান্ত আইনি সংস্কার ৪

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক আইনের সংস্কার ৬

২.৩ আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ৬

২.৪ নির্বাচনী আইনের সংশোধনী প্রস্তাব ৮

২.৫ উপসংহার ৮

অধ্যায় তিন

নির্বাচন সম্পর্কিত কার্যক্রম **৯**

৩.১ নির্বাচন আয়োজন ৯

৩.২ নির্বাচনী আচরণ বিধি ও তার প্রয়োগ ১৪

৩.৩ ভোটার তালিকা: নতুন ও হালনাগাদ ১৫

৩.৪ নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ ১৬

৩.৫ প্রার্থী ও দলের হিসাব নিরীক্ষা ও তথ্য প্রকাশ ১৭

৩.৬ উপসংহার ১৮

অধ্যায় চার

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম **১৯**

৪.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ১৯

৪.২ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ২০

৪.৩ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এবং অফিস কার্যক্রমে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ২১

৪.৪ প্রশিক্ষণ ২২

৪.৫ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ২২

৪.৬ উপসংহার ২৩

অধ্যায় পাঁচ

প্রধান স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা **২৪**

৫.১ সরকার ও প্রশাসন ২৪

৫.২ রাজনৈতিক দল ২৬

৫.৩ গণমাধ্যম ২৭

৫.৪ নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সংস্থা ২৭

৫.৫ উন্নয়ন সহযোগী ২৮

৫.৬ উপসংহার ২৮

অধ্যায় ছয়

নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ **২৯**

৬.১ নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি ২৯

৬.২ নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ ৩০

৬.৩ উপসংহার ৩১

অধ্যায় সাত
উপসংহার **৩২**
৭.১ গবেষণার প্রধান পর্যবেক্ষণ ৩২
৭.২ সুপারিশ ৩৩

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৩৫

পরিশিষ্ট
পরিশিষ্ট ১: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন: কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি (ফেব্রুয়ারি ২০০৭ - আগস্ট ২০১২)
পরিশিষ্ট ২: প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ পদ্ধতি) আইন, ২০১২ (প্রস্তাবিত)
পরিশিষ্ট ৩: নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০১২ (প্রস্তাবিত)
পরিশিষ্ট ৪: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন: সংশোধিত বাজেট ও ব্যয় (২০০৮-০৯ - ২০১২-১৩ অর্থবছর)

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। টিআইবি গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অপরিহার্য মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পথে অন্তরায় এমন বিষয় নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জাতীয় সততা ব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার গুরুত্ব অনুধাবন করে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর ২০০৬ এর নভেম্বরে টিআইবি একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে, যেখানে কমিশনের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিষ্ঠানে চলমান দুর্নীতির ধরন চিহ্নিত করা হয় এবং এসব সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতি রোধে সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়। ২০০৭ এর জানুয়ারিতে নবম জাতীয় নির্বাচন বাতিল হওয়ার পেছনে যেসব কারণ চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে ভুলে-ভরা ভোটার তালিকা, এবং বিরোধী দল ও সমমনা রাজনৈতিক দলের নির্বাচন কমিশনের প্রতি অনাস্থা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

২০০৭ সালে একটি নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন পরবর্তী দুই বছরে নির্বাচনী আইনের সংস্কার, নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম হাতে নেয়, যার ধারাবাহিকতায় ২০০৮ এর ডিসেম্বরে নবম জাতীয় নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। নতুন সরকার গঠনের পর বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন ও বিভিন্ন উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে। ২০১২ এর জানুয়ারি মাসে এই কমিশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনারদের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করা অপরিহার্য, যেখানে নির্বাচন কমিশনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর ইতোমধ্যে আরও কয়েকটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এসব গবেষণার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের পর্যালোচনার সাথে সাথে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয় চিহ্নিত করা হয়েছে।

গবেষণাটি টিআইবি'র গবেষক শাহজাদা এম আকরাম ও সাধন কুমার দাসের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে তাদেরকে সহায়তা দিয়েছেন রবিউল ইসলাম। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে টিআইবি'র গবেষণা বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে তাদের সহায়তা দিয়েছেন। তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, সাবেক নির্বাচন কমিশনারগণ, বিভিন্ন নির্বাচনের প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধি, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, গণমাধ্যমের কর্মী, এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা গবেষণা দলকে মূল্যবান তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাঁদেরকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণা সম্পাদনে টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ নির্বাচন কমিশনকে আরও সক্ষম ও কার্যকর করে তুলতে সাহায্য করবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন ও জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন, যেখানে নির্বাচন প্রক্রিয়া হতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই নির্বাচন আয়োজনের জন্য একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।[১] নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা, প্রেসিডেন্ট, সংসদীয় ও অন্যান্য নির্বাচন পরিচালনা করা, এবং সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা।[২] এসব দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য আরও কিছু দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনকে পালন করতে হয়।

১৯৯০ সালে বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। তবে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে যেকোনো উপায়ে জয়ী হওয়ার মানসিকতা এবং পরাজিত হলে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করার মানসিকতার কারণে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় পরবর্তী নির্বাচনকে প্রভাবিত করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এসব প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতাসীন দলের পছন্দের ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ, প্রশাসনের মাধ্যমে নির্বাচন প্রভাবিত করা, এবং এমনকি পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সম্ভাব্য প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা পরিবর্তন করা (খান, ২০১৩)।

জাতীয় সততা ব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার গুরুত্ব অনুধাবন করে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর ২০০৬ এর নভেম্বরে টিআইবি একটি বিস্তারিত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান দুর্নীতির ধরন চিহ্নিত করা হয় এবং এসব সীমাবদ্ধতা ও দুর্নীতি রোধে সুপারিশ প্রস্তাব করা হয় (আকরাম ও দাস, ২০০৬)।

অষ্টম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার পর নবম জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন নির্বাচন কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন প্রধান স্টেকহোল্ডারের মধ্য থেকেই, যাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন করে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের দাবিতে দেশব্যাপি ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এই প্রেক্ষিতে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি একটি নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, যা ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করে ও জরুরি অবস্থা জারি করে। এই নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতি ও কালোটাকার প্রভাব থেকে মুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নির্বাচনের লক্ষ্যে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যার মধ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন উল্লেখযোগ্য।[৩]

পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন পরবর্তী দুই বছরে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার মধ্যে ছিল জাতীয় পরিচয়পত্রসহ নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস, রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ সংশোধন এবং নতুন আইন প্রণয়ন, নির্বাচনী আচরণ বিধি আরও কঠোর করা, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিবর্তন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, নির্বাচনে সংখ্যালঘু ও নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারাভিযান চালানো হয়। এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০০৮ এর ডিসেম্বরে নবম জাতীয় নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

---

[১] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১১৯। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ ও এসব নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।

[২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১১৯।

[৩] প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ড. এ টি এম শামসুল হুদাকে ২০০৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মুহাম্মদ ছহুল হোসেনকে ৫ ফেব্রুয়ারি ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনকে ১৪ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ দেওয়া হয়।

নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (উপজেলা পরিষদ, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন ও বিভিন্ন উপ-নির্বাচন সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনারদের মেয়াদ শেষ হয় ২০১২ এর জানুয়ারি মাসে। ২০১২ এর জানুয়ারিতে সরকারের পক্ষ থেকে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে সম্ভাব্য কমিশনারদের তালিকা তৈরি করা হয় এবং ৮ ফেব্রুয়ারি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দেওয়া হয়।[৪]

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও সকলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সম্পন্ন করা অপরিহার্য, যেখানে নির্বাচন কমিশনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ গুরুত্ব অনুধাবন করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।[৫] এসব গবেষণার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের ওপর বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের পর্যালোচনার সাথে সাথে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয় চিহ্নিত করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনের পর্যালোচনা করা;
২. নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
৩. নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বিশ্লেষণ করা;
৪. নির্বাচন কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা; এবং
৫. নির্বাচন কমিশনের ভবিষ্যৎ করণীয় সুপারিশ করা।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত। গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এসব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা, প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য ৫১ জন মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মুখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনের ঢাকা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধি, বিভিন্ন নির্বাচনের প্রার্থী ও তাদের প্রতিনিধি, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, সংবাদ-মাধ্যম কর্মী এবং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি।

সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে দলীয় আলোচনা করা হয় (সাতটি উপজেলা পর্যায়ে, চারটি জেলা পর্যায়ে এবং একটি আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে), যেখানে তাঁরা মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন ও প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া গবেষণা দলের পক্ষ থেকে চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন[৬] ও একটি পৌরসভা মেয়র

---

[৪] প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ, এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আবু হাফিজ, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ আবদুল মোবারক, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাভেদ আলী ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. শাহনেওয়াজকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

[৫] এসব গবেষণার মধ্যে রয়েছে 'বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন' (২০০৬), 'নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা: স্থগিত নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন পর্যন্ত প্রার্থীদের নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের ওপর একটি বিশ্লেষণ' (২০০৭), 'নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা: প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ওপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ' (২০০৯), 'রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' (২০০৯) এবং 'জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় অংশগ্রহণ ও প্রত্যাশা' (২০১০)।

[৬] কুমিল্লা, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা সিটি করপোরেশন নির্বাচন।

নির্বাচনের[৭] সময়ে মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এসব নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময়ে প্রায় ৩০০ জন ভোটারের কাছ থেকে সরাসরি মতামত নেওয়া হয়, এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

পরোক্ষ তথ্য উৎসের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানসহ নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর গবেষণা প্রতিবেদন, নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত নথিপত্র, বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, বই, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন, এবং সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংবাদ ও বিশ্লেষণ।

১.৪ গবেষণার সময়

এ গবেষণার সময়কাল ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত। গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয় ২০১১ সালের অক্টোবর থেকে ২০১৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত।

১.৫ প্রতিবেদনের কাঠামো

এই প্রতিবেদন সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে এ গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও আওতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গত নির্বাচন কমিশনের দ্বারা সাধিত নির্বাচন সংক্রান্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন আইনি সংস্কার, এবং বর্তমানে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। এরপর নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রতিবেদনের পঞ্চম অধ্যায়ে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। সবশেষে গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে উত্তরণের উপায় নিয়ে সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনের সপ্তম অধ্যায়ে।

[৭] নরসিংদী পৌরসভা মেয়র নির্বাচন।

অধ্যায় দুই

নির্বাচন ও নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত আইনি সংস্কার

২০০৭ এর ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্কার করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেয়, যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার যেমন রাজনৈতিক দল, নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের সাথে সংলাপ উল্লেখযোগ্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে নির্বাচনী আইন সংস্কার নিয়ে নির্বাচন কমিশন সক্রিয় উদ্যোগ নেয় এবং সরকার 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' সংশোধন করে। প্রাথমিকভাবে ২০০৮ সালের ১২ নভেম্বর সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ জারি করা হয় যার ভিত্তিতে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯) প্রথমবারের মতো 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়।[৮] পরবর্তীতে এর ওপর ভিত্তি করে 'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ২০০৮' প্রণয়ন, 'নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২' রহিত করে 'নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ২০০৮'[৯] প্রণয়ন, এবং 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮'[১০] প্রণয়ন করে নির্বাচন কমিশন। এছাড়া নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কয়েকটি প্রাতিষ্ঠানিক আইনের সংস্কার সম্পন্ন করে। এ অধ্যায়ে নির্বাচন ও নির্বাচন সংক্রান্ত আইনের সংস্কার ও বিদ্যমান আইনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ নির্বাচন সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য আইনি সংস্কার

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য আইনি সংস্কার করা হয়।

১. **নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতার শর্ত বৃদ্ধি:** নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতার শর্ত বাড়িয়ে বিল ও ঋণ খেলাপি, দেশি বা আন্তর্জাতিক আদালত কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধাপরাধী, এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তাদের অবসর গ্রহণের পর কমপক্ষে তিন বছর পর্যন্ত নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়।[১১]

২. **প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা:** নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে অবশ্যই ভোটার হওয়া এবং মনোনয়ন পত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে আট ধরনের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়।[১২] আট ধরনের তথ্যের মধ্যে রয়েছে (১) শিক্ষাগত যোগ্যতা, (২) বর্তমানে প্রার্থীর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ফৌজদারি অপরাধের তালিকা, (৩) অতীতের ফৌজদারি মামলার তালিকা ও ফলাফল, (৪) প্রার্থীর পেশা, (৫) প্রার্থীর আয়ের উৎস(সমূহ), (৬) অতীতে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণে তার ভূমিকা, (৭) প্রার্থী ও তার ওপর নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়-দেনার বর্ণনা, এবং (৮) ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে এবং এমন কোম্পানি থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ও বর্ণনা যে কোম্পানির তিনি সভাপতি, বা নির্বাহী পরিচালক বা পরিচালক।

৩. **রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন:** সংশোধিত 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ২০০৯'-এ রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হওয়ার সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়[১৩] এবং এর জন্য নতুন একটি অধ্যায় (অধ্যায় ৬এ) সংযোজন করা হয়। নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রে বৈদেশিক ও অঙ্গ-সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও যেসব দল স্বাধীনতার পর থেকে কোনো সংসদ নির্বাচনেই আসন লাভ করেনি এবং মোট ভোটের ৫ শতাংশের কম ভোট পেয়েছে তারা নিবন্ধনের যোগ্য বলে বিবেচিত না হওয়া, এবং প্রতিটি দলের নিজস্ব সংবিধান থাকা ও প্রতিটি দলের বিভিন্ন কমিটিতে নির্বাচিত সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়।

---

[৮] পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংশোধিত গঠনতন্ত্র জমা দেওয়ার সময় বাড়িয়ে এই আইন সংশোধন করা হয়।

[৯] ২৩ অক্টোবর ২০০৮; এসআরও নং ২৮৬ আইন/২০০৮।

[১০] ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮; এসআরও নং ২৬৯ আইন/২০০৮।

[১১] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ১২ (১)।

[১২] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ১২ (৩খ)।

[১৩] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ৯০ক।

৪. **রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা:** নিবন্ধিত প্রতিটি দলের সংবিধানে ২০২০ সালের মধ্যে সব কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়।[১৪]

৫. **জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা:** নিবন্ধিত প্রতিটি দলের ক্ষেত্রে প্রতিটি আসন থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক করা হয়।[১৫]

৬. **নির্বাচনী কেন্দ্র পরিবর্তন ও প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা:** প্রার্থিতা চূড়ান্ত করার পর যদি দেখা যায় কোনো কেন্দ্র কোনো প্রার্থীর দখলে রয়েছে তাহলে ঐ কেন্দ্র বাতিল বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তাকে দেওয়া হয়।[১৬] এছাড়া যেকোনো প্রার্থীর নির্বাচনী আইন ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের শাস্তিস্বরূপ নির্বাচন কমিশনকে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা দেওয়া হয়।[১৭]

৭. **একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ তিনটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশোধনের মাধ্যমে এবারই প্রথমবারের মতো একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ কমিয়ে সর্বোচ্চ তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া হয়।[১৮]

৮. **নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা পুনর্নির্ধারণ:** সমসাময়িক আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে একজন প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। পূর্বে একটি আসনের জন্য এটি ছিল পাঁচ লাখ টাকা যা বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা করা হয়।[১৯] একইভাবে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়।[২০]

৯. **প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি:** নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীদের জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরির জন্য বেশ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। এসব বিধি-নিষেধের মধ্যে কমিশন নির্ধারিত আকারের বাইরে পোস্টার ছাপানো, একাধিক রঙের পোস্টার ছাপানো, কোনো তোরণ, ফটক বা বাধা নির্মাণ, তিনটির বেশি মাইক্রোফোন বা লাউডস্পিকার ব্যবহার, একটি ওয়ার্ডে একাধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন, ভোটারদের কোনো ধরনের মনোরঞ্জন করা, যানবাহন ভাড়া বা ব্যবহার, মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শো-ডাউন করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[২১] নবম সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮' প্রণয়ন করা হয়, যেখানে আরও কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, যেমন তফসিল ঘোষণার পর ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের আগে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করা, চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা এর অঙ্গীকার বা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা, সরকারি ডাক বাংলো, রেস্ট হাউস ও সার্কিট হাউস বা কোনো সরকারি কার্যালয়কে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা, জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করে জনসভা করা, পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদি দেয়ালে লাগানো, তিন মিটারের বেশি উচ্চতার নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহার, বিদ্যুতের সাহায্যে আলোকসজ্জা করা, ধর্মীয় উপাসনালয়ে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো ইত্যাদি। এছাড়া নির্বাচনী মামলা ছয়মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২২]

১০. **শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কঠোরতা বৃদ্ধি:** নির্বাচন-পূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় শাস্তি, এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে শাস্তি অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নির্ধারিত ফরমে উল্লিখিত উৎস ছাড়া অন্য কোনো উৎস থেকে নির্বাচনী ব্যয় করলে জরিমানাসহ দুই

---

[১৪] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ৯০খ।

[১৫] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ৯০খ (১)(খ)(ঈ) অনুযায়ী "... নিবন্ধনে আগ্রহী রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে নিম্নের সুস্পষ্ট বিধান থাকিবে ... সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, উপজেলা বা ক্ষেত্রমত থানা ও জেলা কমিটির দলীয় সদস্যগণ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর প্যানেল তৈরি করিবে এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড উক্ত প্যানেল হইতে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে"।

[১৬] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ৮।

[১৭] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ৯১ঙ।

[১৮] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ১৩ক (১)। আগে একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন।

[১৯] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ৪৪খ (১)। নির্বাচন কমিশন থেকে ৩০০ আসনের প্রত্যেকটির জন্য একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ কত টাকা ব্যয় করতে পারবেন তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি (৬ নভেম্বর ২০০৮, নং নিকস/জঃসঃ/প্রেস রিলিজ/২০০৮/) বা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট <www.ecs.gov.bd>

[২০] এটি ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, যেমন ভোটার সংখ্যা এক লাখ পর্যন্ত হলে নির্বাচনী ব্যয় সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা, ভোটার সংখ্যা এক থেকে দুই লাখ হলে নির্বাচনী ব্যয় সর্বোচ্চ সাত লাখ টাকা এবং ভোটার সংখ্যা দুই থেকে তিন লাখ বা তার বেশি হলে নির্বাচনী ব্যয় সর্বোচ্চ দশ লাখ টাকা নির্ধারিত হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন (৮ নভেম্বর ২০০৮, নং নিকস/জঃসঃ/প্রেস রিলিজ/২০০৮/) বা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট <www.ecs.gov.bd>

[২১] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ৪৪খ (৩ক)।

[২২] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন* ২০০৯, ধারা ৫৭(৬)।

থেকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।[২৩] নির্বাচনী এজেন্ট ছাড়া অন্য কারও প্রার্থীর পক্ষে ব্যয় করা, নিষিদ্ধ কাজে ব্যয় করা, ব্যয়ের হিসাব জমা না দেওয়া, কোনো ভোটারকে ভোট দিতে যাওয়ার জন্য যান-বাহন ভাড়া করা ইত্যাদি কাজের জন্যও শাস্তি একই।[২৪] এছাড়াও হাইকোর্ট কোনো নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল করতে পারেন যদি দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কাজের দ্বারা নির্বাচনী ফলাফল হাসিল করা হয়, এবং অনুমোদিত অর্থের বেশি অর্থ ব্যয় করে থাকেন বলে প্রমাণিত হয়।[২৫]

১১. **'না' ভোটের সুযোগ:** সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এ 'না' ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়, এবং কোনো আসনে ৫০ শতাংশের বেশি 'না' ভোট পড়লে পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখা হয়। পরবর্তীতে সরকার গঠনের পর প্রণীত 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯'-এ এই ধারা বাতিল করে দেওয়া হয়।

১২. **প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা:** প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে 'ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০১০' ২০১০ এর ৭ ডিসেম্বর সংসদে গৃহীত হয়। এই আইন অনুযায়ী যেকোনো বাংলাদেশি বিদেশে থাকা অবস্থায় তার নিজের সংসদীয় আসনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক আইনের সংস্কার

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত কিছু উল্লেখযোগ্য আইনি সংস্কার করা হয়।

১. **নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা:** বর্তমান সরকার ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯' প্রণয়ন করে যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন থেকে সরিয়ে নির্বাচন কমিশনের অধীনে আনা হয়। তবে এই আইনে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অধীনে রাখার কথা বলা হয়েছে যা নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রণীত জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত একটি আদেশ দলীয় সরকারের প্রথম সংসদ অধিবেশনে গৃহীত না হওয়ায় এই কর্তৃপক্ষ অকার্যকর হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ২০১০ এর ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় পরিচয় পত্র সংক্রান্ত আইন প্রণীত হওয়ার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের একটি প্রকল্প হিসেবে সংযুক্তি ঘটে।

২. **নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়োগ বিধি জারি:** নির্বাচন কমিশনের ১৯৭৯ সালের নিয়োগ বিধি বাতিল করে 'নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধি, ২০০৯' জারি করা হয়। এই বিধিতে কোনো কোটা ব্যবস্থা রাখা হয়নি। প্রধান ও মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কার্যালয়ের সব কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠতার তালিকার ভিত্তিতে পদোন্নতি করার বিধান করা হয়।

এছাড়াও যেসব উদ্যোগ নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতায়নের সহায়ক তার মধ্যে ছিল নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন প্রতিরোধ করার জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতায়ন। ২০০৯ এর ২৩ জুলাই এ সংক্রান্ত আদেশ দেওয়া হয় এবং সংসদে এ সংক্রান্ত 'মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯' উত্থাপন করা হয় ২০০৯ এর ১৩ সেপ্টেম্বর। এই আইনের মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন প্রতিরোধ করার জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে পারবেন, এবং একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করতে পারবেন।

২.৩ আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বর্তমানে প্রচলিত আইনি কাঠামোয় নিচের সীমাবদ্ধতাগুলো লক্ষ করা যায়।

১. ***প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের অনুপস্থিতি:*** প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ একটি বিতর্কিত বিষয় হলেও এখন পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোনো আইন প্রণীত হয়নি। উচ্চ পর্যায়ের অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ২০০৮-এর শেষে এবং নির্বাচিত সরকারের কাছে ২০১১ সালের ২১ নভেম্বর আবার খসড়া আইনের আকারে প্রস্তাব পাঠানো হয়।[২৬] তবে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের একটি আইন প্রণয়ন করা হবে বলা হলেও এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। বরং নতুন নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে

---

[২৩] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ৭৩।
[২৪] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ৭৩ ও ৭৪।
[২৫] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ৬৩।
[২৬] দেখুন পরিশিষ্ট ২।

একটি অনুসন্ধান কমিটি[২৭] গঠন করা হয়। এই কমিটি বৈঠক করে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সম্ভাব্য কমিশনারদের নাম আহবান করে। এসব নামের ওপর ভিত্তি করে একটি তালিকা তৈরি করা হয়, এবং এই তালিকা থেকে একজনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও চারজনকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ২০১২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি নিয়োগ দেওয়া হয়।

২. *নির্বাচনের সময় মন্ত্রণালয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ সুনির্দিষ্ট না থাকা:* নির্বাচনের সময় ও নির্বাচন-পরবর্তী কতদিন পর্যন্ত এবং কোন কোন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনের অধীন থাকবে তা সুনির্দিষ্ট করা নেই। ফলে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হলে নির্বাচন কমিশনকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে হয়।

৩. *নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অযোগ্যতাজনিত সদস্যপদ বাতিলের ক্ষমতার অনুপস্থিতি:* বর্তমান আইনে যেসব কারণে একজন ব্যক্তি সংসদ সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অযোগ্য ঘোষিত হন, সে ধরনের তথ্য গোপন করে নির্বাচিত হওয়ার পর সেসব অযোগ্যতা প্রকাশিত হলে তাকে সংসদ সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে নেই।

৪. *জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক না করা:* ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রণীত 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯'-এ জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ধারায় কিছুটা পরিবর্তন এনে বলা হয় "... উক্ত প্যানেল বিবেচনা করে প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করিবে", অর্থাৎ তৃণমূলের সুপারিশ অনুযায়ী মনোনয়ন এখন বাধ্যতামূলক নয়।

৫. *প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই ব্যবস্থার অনুপস্থিতি:* বর্তমান আইনে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই করার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রার্থীরা নির্ধারিত ব্যয়সীমার বাইরে অতিরিক্ত খরচ করলেও তারা ঐ সীমার মধ্যেই রিটার্ন দাখিল করে, যা যাচাই-বাছাই করা হবে না বলে প্রার্থীরা জানে।

৬. *রাজনৈতিক দলের আর্থিক হিসাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা:* বর্তমান আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের এক বছরের নিরীক্ষাকৃত আর্থিক হিসাব নির্বাচন কমিশনে পরবর্তী বছরের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হলেও এই হিসাব নির্বাচন কমিশন জনগণের জন্য প্রকাশ করবে কিনা সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে এখন পর্যন্ত কোনো দলের আর্থিক হিসাব নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়নি।

৭. *তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচনী প্রচারণা আচরণ বিধির অন্তর্ভুক্ত না করা:* বর্তমান আইন অনুযায়ী নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনী প্রচারণার জন্য আচরণ বিধি প্রযোজ্য হবে। তবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার অনেক আগে থেকেই নির্বাচনী প্রচারণার জন্য ব্যয় শুরু হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আইনগতভাবে নির্বাচন কমিশনের কিছু করার থাকে না।

৮. *নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের শাস্তির ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা:* নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আইনে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। যেমন 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯' এর ধারা ৭৩ (২ক) অনুযায়ী কোনো প্রার্থী ধারা ৪৪খ এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করেন যার মধ্যে রয়েছে নির্বাচনী প্রচারণায় ১৫ লাখ টাকার বেশি ব্যয় (ধারা ৪৪খ ৩) তাহলে দুই থেকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। আবার একই ধরনের লঙ্ঘনের জন্য ধারা ৬৩ (১ঙ) অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল করা যাবে। আবার আচরণ বিধিমালায় বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা, যেমন পোস্টার ছাপানোর ক্ষেত্রে নির্ধারিত রঙ এবং আকার (ধারা ৭ ৩) সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর ধারা ৪৪খ (৩ক) এর সাথে মিলে যাওয়া সত্ত্বেও একই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার জন্য আচরণ বিধিমালায় উল্লিখিত শাস্তি অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, যেখানে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে উল্লিখিত শাস্তি দুই থেকে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড। অর্থাৎ বিধিমালায় উল্লিখিত শাস্তির ধরন ও পরিমাণ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে উল্লিখিত শাস্তির পরিমাণের চাইতে কম।[২৮]

৯. *নির্বাচনে সমান ক্ষেত্র তৈরি না হওয়া:* সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী সংসদ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বর্তমান সংসদ সদস্যরা নিজ নিজ পদে থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে বিদ্যমান 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) ১৯৭২' বা নির্বাচনী আচরণ বিধিতে নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী বা সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা বা সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রণের কোনো বিধান নেই। এ কারণে নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করা যাবে না।

---

[২৭] রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব অনুযায়ী অনুসন্ধান কমিটি হচ্ছে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট – এর প্রধান সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি; সদস্যরা হচ্ছেন হাইকোর্টের একজন বিচারপতি, বাংলাদেশ কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান। এই কমিটি ২০১২ এর ২১ জানুয়ারি একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গঠিত হয়।

[২৮] প্রকৃতপক্ষে নির্বাচন কমিশন প্রণীত আচরণ বিধিমালা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের চেয়ে দুর্বল। তাই এই বিধিমালা কোনোভাবেই মূল আইনের বিধান খর্ব করার ক্ষমতা রাখে না।

২.৪ নির্বাচনী আইনের সংশোধনী প্রস্তাব

কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ২০১১ সালের সংলাপের ভিত্তিতে সরকারের কাছে আরও নির্বাচনী সংস্কারের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯ এর আরও সংশোধনীর সুপারিশ করে।[২৯] এসব সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

- সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার দিন থেকে পরবর্তী সরকার গঠন পর্যন্ত সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ না করে নির্বাচন-সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া;
- আদালত কর্তৃক পলাতক ঘোষিত ব্যক্তির নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য না হওয়া;
- সম্ভাব্য প্রার্থী মনোনয়নপত্রের সাথে মিথ্যা তথ্য দিলে মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়া;
- কোনো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন বলে প্রমাণিত হলে তার সদস্যপদ বাতিল হওয়া;
- প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ জেলা ও ১০০টি উপজেলা/ মেট্রোপলিটন শহরের থানায় সক্রিয় দপ্তর থাকা, এবং এ শর্ত পূরণ না হলে দলের নিবন্ধন বাতিল হওয়া;
- দল থেকে একাধিক মনোনীত প্রার্থীর মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া;
- জামানতের পরিমাণ ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০ হাজার টাকা করা;
- নির্বাচন চলাকালে প্রত্যেক প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব প্রত্যেক সপ্তাহের শেষে জমা দেওয়া; এবং
- নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহার করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকা।

এছাড়াও সাবেক নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণী আইনের সংশোধনমূলক আরেকটি খসড়া প্রস্তাব করা হয়।[৩০] এসব সংশোধনী প্রস্তাব আইন মন্ত্রণালয় থেকে বর্তমান কমিশনের পর্যালোচনার জন্য ফেরত পাঠানো হয় ২০১২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। বর্তমান কমিশন বিদ্যমান আইন ও পূর্ববর্তী কমিশনের সংশোধনী প্রস্তাব পর্যালোচনা করে ২০১৩ এর এপ্রিল মাসে আবার আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়, যার ওপর পর্যবেক্ষণ দিয়ে আবার মন্ত্রণালয় ফেরত পাঠায় মে মাসে। কমিশন তা পুনরায় পরীক্ষা করে ২৫ জুলাই আবার মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। উল্লেখ্য, কমিশনের পক্ষ থেকে আরও যেসব সংশোধনী প্রস্তাব পাঠানো হয় তার মধ্যে প্রার্থিতা বাতিল সংক্রান্ত ৯১-ই ধারা বাদ দেওয়া, প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে যুদ্ধাপরাধ[৩১] অন্তর্ভুক্ত করা, নির্বাচনকালীন যেসব মন্ত্রণালয়ের কর্ম পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ না করে নির্বাচন-সম্পর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার সুপারিশ ছিল তার মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্তর্ভুক্ত করা, নির্বাচনী অপরাধের জন্য বিদ্যমান সাজার পরিমাণ কমিয়ে পাঁচ বছর করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন পক্ষ থেকে ব্যাপক সমালোচনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন ৯১-ই ধারা বাতিলের প্রস্তাব থেকে সরে আসে।[৩২] উল্লেখ্য, আসন্ন দশম সংসদ নির্বাচন আয়োজনের প্রেক্ষিতে যেসব আইনি সংশোধন করা প্রয়োজন তা ২০১৩ সালের মধ্যে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো ও মার্চের মধ্যে সংশোধন করার কথা ছিল। আইন সংশোধনের যেসব প্রস্তাব করা হয়েছে তা বর্তমান সংসদ থাকাকালীন অধিবেশনে উত্থাপন করা ও পাস করা হবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে।

২.৫ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যায় ২০০৭ সালে পুনর্গঠিত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে যার ফলে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আরও নিয়ন্ত্রণমূলক নজরদারীর মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা ও নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়োগ বিধি জারি করা হয়, যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়। তবে এসব ইতিবাচক পরিবর্তন সত্ত্বেও এখনো বেশ কিছু আইনি সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে।

---

[২৯] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.ecs.gov.bd/QLExternalFilesEng/202.pdf।

[৩০] দেখুন পরিশিষ্ট ৩।

[৩১] ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইবুনালস) অ্যাক্ট ১৯৭৩-এর অধীনে কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে।

[৩২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.ecs.gov.bd/NewsFilesEng/104.pdf (৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩)।

অধ্যায় তিন

নির্বাচন সম্পর্কিত কার্যক্রম

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের প্রধান দায়িত্ব ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা, প্রেসিডেন্ট, সংসদীয় ও অন্যান্য নির্বাচন পরিচালনা করা, এবং সংসদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সংসদীয় এলাকা নির্ধারণ করা। একজন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনায় নিম্নলিখিত শর্তগুলো মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ।[৩৩]

- একজন ভোটার বা একজন প্রার্থী হিসেবে প্রতিটি যোগ্য নাগরিকের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে;
- মতামতের স্বাধীনতা থাকতে হবে যেন গণতান্ত্রিক অধিকার অবাধে প্রকাশ করতে পারে;
- নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়মিত হতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে;
- নির্বাচন পরিচালনায় কর্তৃপক্ষের নিরপেক্ষতা থাকতে হবে; এবং
- অবাধে ভোট প্রদান এবং সঠিক গণনা নিশ্চিত করতে যথাযথ আইন ও প্রক্রিয়া থাকতে হবে এবং একটি স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকতে হবে যার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার সততা নিশ্চিত করবে।

এ অধ্যায়ে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন সম্পর্কিত কার্যক্রমের একটি পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.১ নির্বাচন আয়োজন

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন আয়োজন করে, যার মধ্যে রয়েছে নবম জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে নির্বাচন ও পরবর্তীতে ১৬টি উপ-নির্বাচন, জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন, ১৩টি সিটি করপোরেশন নির্বাচন, ২৮৪টি পৌরসভা নির্বাচন, ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ ও ৪,৪৩১টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (সারণি ১)।[৩৪]

৩.১.১ *জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বিভিন্ন আসনের উপ-নির্বাচন*

নির্বাচন কমিশন ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন শূন্য আসনে উপ-নির্বাচন আয়োজন করে।

সারণি ১: নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত নির্বাচনের তালিকা (ফেব্রুয়ারি ২০০৭ - আগস্ট ২০১৩)

	নির্বাচন	সংখ্যা	অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
১	**নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন**	৩০০ আসনে	২৯ ডিসেম্বর ২০০৮
২	**জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচন**	সাতটি শূন্য আসনে (রংপুর ৩, ৬, কুড়িগ্রাম ২, বগুড়া ৬, ৭, বাগেরহাট ১, কিশোরগঞ্জ ৬)	মার্চ ২০০৯
		একটি শূন্য আসনে (ভোলা ৩)	২৪ এপ্রিল ২০১০
		দুইটি শূন্য আসনে (ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩, হবিগঞ্জ ১)	২৭ জানুয়ারি ২০১১
		একটি শূন্য আসনে (শরিয়তপুর ৩)	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত)
		একটি শূন্য আসনে (গাজীপুর-৪)	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২
		একটি শূন্য আসনে (টাঙ্গাইল-৩)	২৮ নভেম্বর ২০১২
		একটি শূন্য আসনে (চট্টগ্রাম-১২)	১৭ জানুয়ারি ২০১৩

[৩৩] মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার অনুযায়ী।

[৩৪] নির্বাচন কমিশন থেকে সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও বর্তমান সরকারের সময়ে ৫,৭২৩টি উপ-নির্বাচন, সিটি করপোরেশন ও অন্যান্য স্থানীয় সরকারর প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন হয়েছে বলে প্রধানমন্ত্রী গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানান। (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯ আগস্ট ২০১৩)।

	নির্বাচন	সংখ্যা	অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ
		একটি শূন্য আসনে (কিশোরগঞ্জ-৪)	৩ জুলাই ২০১৩
৩	**জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে**	৫০টি আসনে	২৪ মার্চ ২০০৯ (৪৫টি) ডিসেম্বর ২০১১ (৫টি)
৪	**রাষ্ট্রপতি নির্বাচন**	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০০৯	১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
		রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০১৩	২২ এপ্রিল ২০১৩
৫	**সিটি করপোরেশন নির্বাচন**	চারটি সিটি করপোরেশন (খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল)	৪ আগস্ট ২০০৮
		একটি সিটি করপোরেশন (চট্টগ্রাম)	১৭ জুন ২০১০
		একটি সিটি করপোরেশন (নারায়ণগঞ্জ)	৩০ অক্টোবর ২০১১
		একটি সিটি করপোরেশন (কুমিল্লা)	৫ জানুয়ারি ২০১২
		একটি সিটি করপোরেশন (রংপুর)	২০ ডিসেম্বর ২০১২
		একটি সিটি করপোরেশন (গাজীপুর)	৬ জুলাই ২০১৩
		চারটি সিটি করপোরেশন (খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল)	১৫ জুন ২০১৩
৬	**পৌরসভা নির্বাচন**	নয়টি পৌরসভা	৪ আগস্ট ২০০৮
		২৭৫টি পৌরসভা*	১৩ জানুয়ারি ২০১০ - ২৪ জুন ২০১২
৭	**উপজেলা পরিষদ নির্বাচন***	৪৮১টি উপজেলা পরিষদ	২২ জানুয়ারি ২০০৯
৮	**ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন***	৪,৪৩১টি ইউনিয়ন পরিষদে	২৯ মার্চ - ৩ এপ্রিল ২০১১ (উপকূলীয় এলাকার ৫৫৩টি)
			৩১ মে ২০১১ - ২৪ জুন ২০১২ (৩,৮৭৮টি)

* নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, 'বর্তমান সরকারের বিগত তিন বছরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে অর্জন বিষয়ক প্রতিবেদন', ২৭ জুন ২০১২ অনুযায়ী।

নবম জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলো স্বীকার করে নেয়। দেশী-বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষক, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ ভোটাররা নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং নির্বাচন কমিশনের ভূয়সী প্রশংসা করে। প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে বিচ্ছিন্নভাবে পুকুরচুরি হয়েছে বললেও নির্বাচনের ফলাফল অস্বীকার করে কোনো আন্দোলনে যায়নি। তবে নির্বাচনে সার্বিক ভোট প্রদানের হার (৮৭.১৬ শতাংশ), এবং বিশেষকরে ৮৫টি আসনে ৯০ শতাংশের ওপর ভোট প্রদানের হার নিয়ে কোনো কোনো স্টেকহোল্ডারের পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয় (আখতার ২০০৯)।[৩৫]

পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল না থেকে নিজস্ব জনবল দিয়ে নির্বাচন আয়োজন করে। ২০০৯ সালে প্রথমবারের মত সাতটি আসনে উপ-নির্বাচনে নিজস্ব জনবল দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য চারজন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়, এবং সবগুলো উপ-নির্বাচনই সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া নবম জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এসব উপ-নির্বাচনের বেশিরভাগ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলেও ভোলা-৩ উপ-নির্বাচনে সহিংসতার ঘটনা ঘটে এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয় (দেখুন বক্স ১)। তবে পরবর্তীতে প্রধান বিরোধী দল হবিগঞ্জ-১ উপ-নির্বাচনে জয়লাভের পর আর কোনো উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

৩.১.২ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক কাঠামো হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এর আগে সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে, যার মেয়াদ শেষ হয় ২০০৮ সালের জুনে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০১০ সালের মে মাসে তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি থাকলেও সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা[৩৬] সংশোধন না করায় এই নির্বাচন পিছিয়ে যায়। ২০১০ এর ১২ এপ্রিল ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত ধারা সংশোধন করে সংশোধিত আইন মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়, এবং একই বছরের ৪

[৩৫] প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী চারটি আসনে প্রদত্ত ভোট ছিল মোট ভোটারের প্রায় ৯৫ শতাংশ।

[৩৬] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯*, ধারা ১৩ (১)। এই ধারা অনুযায়ী একটি ইউনিয়ন পরিষদের এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডের ভোটার বৈষম্য ১০ শতাংশের মধ্যে রাখতে হত। এতে ৪,৫০২টি ইউনিয়নে নতুন সীমানা নির্ধারণ করতে গেলে দেশের অগণিত গ্রাম/মৌজা বা তার অংশবিশেষ খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া, অহেতুক সামাজিক বিশৃঙ্খলাসহ মামলা-মোকদ্দমা বেড়ে যাওয়া, এবং এর ফলে নির্বাচন আরও পিছিয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। উল্লেখ্য, 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯' সংসদে গৃহীত হয় ২০০৯ এর ১৫ অক্টোবর।

অক্টোবর এর খসড়া বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়। এই সংশোধন অনুযায়ী পুরানো সীমানাতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে। এছাড়াও ২০১০ এর ১২ আগস্ট নির্বাচন কমিশন প্রথমবারের মত 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০' প্রণয়ন করে, এবং ১৫ জুলাই চেয়ারম্যান ও সদস্যপদ প্রার্থীদের জন্য প্রথমবারের মত 'ইউনিয়ন পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা ২০১০' প্রণয়ন করে।

বক্স ১: ভোলা-৩ উপ-নির্বাচনঃ সহিংসতার অভিযোগ

বিক্ষিপ্ত হামলার ঘটনা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে ২০১০ এর ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয় ভোলা-৩ (লালমোহন-তজুমদ্দিন) আসনের উপ-নির্বাচন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপক প্রস্তুতি ও টহলের মধ্যেও বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রের বাইরে ও আশেপাশে সরকারি দলের কর্মীদের দ্বারা ভোটারদের বাধা দেওয়া, হামলা ও কেন্দ্র থেকে বিএনপি'র এজেন্টদের বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটে, যেখানে অন্তত ১৩ জন আহত হয়। নির্বাচন কমিশন নয়টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করে। সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরুর পর কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের উপস্থিতি ভাল থাকলেও বেলা ১১টার পর থেকে ফাঁকা হতে থাকে। সকালে বিএনপি ৩০টি কেন্দ্রের ব্যাপারে অভিযোগ করে। নির্বাচন কমিশন বিভিন্নভাবে তদন্ত করে নয়টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করে, যার সবগুলো লালমোহন উপজেলায় অবস্থিত।

বিএনপি'র প্রার্থী হাফিজউদ্দিন আহমেদ অভিযোগ করেন, কেন্দ্রে না যাওয়ার জন্য তার ভোটারদের আগের রাতে হুমকি, হামলা ও ভোটের দিন পথে পথে বাধা দেওয়া হয়। তারা টহলরত পুলিশের সাহায্য চেয়েও পাননি। তবে এসব কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা দাবি করেন, কেন্দ্রের ভেতর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে শতভাগ না হলেও ভোলা-৩ আসনের উপ-নির্বাচন সফল হয়েছে। তিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রশংসা করে জানান, নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য স্থানীয়দের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। সাধারণ হিসাব অনুযায়ী ছয়গুণ বেশি পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে; র‍্যাবের ২৪০ জন সদস্য দায়িত্ব পালন করেছেন। বিএনপি'র প্রার্থী নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবি জানালে এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান সমন্বয়ক তোফায়েল আহমেদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি না থাকলেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনী মোতায়েনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ২০১০; জানিপপ-এর নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

২০১১ এর ২৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। তফসিল অনুযায়ী ২০১১ এর ২৯ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকার ১২ জেলার ৫৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদে এবং পরবর্তী তফসিল অনুযায়ী ৩১ মে থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত বাকি জেলাগুলোর ৩,৮১৩টি - মোট ৪,৩৬৬টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ৪,২৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন সম্পন্ন হয়, এবং বাকিগুলোতে নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[৩৭] ২০১২ এর ২৪ জুন পর্যন্ত মোট ৪,৪৩১টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, প্রথম পর্যায়ের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলো বেশিরভাগ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় কমপক্ষে ৪৫ জন নিহত ও ১২,০০০ এর বেশি মানুষ আহত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরাজিত প্রার্থীর সমর্থকদের আক্রমণে এসব সহিংসতার ঘটনা ঘটে। নির্বাচন কমিশনের মতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অপ্রতুলতার সুযোগ নিয়ে এসব ঘটনা ঘটে।[৩৮]

৩.১.৩ *উপজেলা পরিষদ নির্বাচন*

উপজেলা পরিষদের ইতিহাসে প্রথম মেয়াদে ১৯৮৫ সালে এবং দ্বিতীয় মেয়াদে ১৯৯০ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালের নভেম্বর মাসে তৎকালীন সরকার উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি বাতিল করে[৩৯] এবং ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার নেতৃত্বে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন ১৯৯১' গঠন করে। এই পর্যালোচনা কমিশন বাংলাদেশে জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে দুই স্তরবিশিষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সরকার কাঠামোর সুপারিশ করে।[৪০] পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে নবগঠিত সরকার উপজেলা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্য আট সদস্যবিশিষ্ট আরেকটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'স্থানীয় সরকার কমিশন' গঠন করে এবং 'উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮' প্রণয়ন করে। উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তে সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

[৩৭] সূত্রঃ ডেমোক্রেসি ওয়াচ (৫ জুলাই ২০১১ পর্যন্ত)।

[৩৮] *দ্য ডেইলি স্টার*, ৩০ জুলাই ২০১১।

[৩৯] *স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন বাতিল) অধ্যাদেশ ১৯৯১*।

[৪০] ড. মো. মকসুদুর রহমান, *বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন,* প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮, পৃ. ৩৩৩।

সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় 'উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ ২০০৮' (৩০ জুন ২০০৮) জারি করা হয়, যেখানে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা পুনরায় নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত করা হয়।[৪১] দীর্ঘ ১৮ বছর পর ২০০৯ সালের ২২ জানুয়ারি তৃতীয় মেয়াদে ৪৮১টি উপজেলা পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৩.১.৪ পৌরসভা নির্বাচন

২০১০ এর ১২ এপ্রিল পৌরসভার সংশোধনী আইন মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের মত পৌরসভা আইনেও নির্বাচনের জন্য সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুই ওয়ার্ডের মধ্যে জনসংখ্যার ব্যবধান ১০ শতাংশের বেশি না হওয়ার[৪২] শর্তের কারণে মামলা মোকদ্দমার আশংকা ও একই কারণে আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু আইন সংশোধনে দীর্ঘসূত্রতার ফলে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। ২০১০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 'পৌরসভা (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০' এবং ৫ অক্টোবর 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০' প্রণীত হয়।

২০১০ এর ২ ডিসেম্বর নির্বাচন কমিশন পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে।[৪৩] বাংলাদেশের মোট ৩১০টি পৌরসভার মধ্যে ১৭টির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া এবং মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ২৪টিতে আপাতত নির্বাচন সম্ভব নয় বলে ২৬৯টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ২৬২টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৪৪] এবারই প্রথম দলীয় মনোনয়নে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়।[৪৫] নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ২০১২-এর জুন পর্যন্ত মোট ২৭৫টি পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনে এসব পৌরসভার নির্বাচন সার্বিকভাবে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।[৪৬]

৩.১.৫ সিটি করপোরেশন নির্বাচন

কোনো কোনো সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সময়সীমা মেনে চলতে পারেনি বলে লক্ষ করা যায়। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ এর ৪ আগস্ট। ২০০৯ সালের অক্টোবরে সিটি করপোরেশন নির্বাচনের আইন প্রণীত হয়।[৪৭] আইনের ৩৪ (খ) ধারা অনুযায়ী করপোরেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্ববর্তী ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা যা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে 'সিটি করপোরেশন নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১০', 'সিটি করপোরেশন (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১০', এবং 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০' জারি করে। ২০১১ এর ১০ জানুয়ারি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) প্রতিষ্ঠা বিধিমালা, ২০১০' প্রণয়ন করে, যেখানে সরকার চারটি নতুন সিটি করপোরেশন গঠন করার ঘোষণা দেয়।[৪৮]

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় ২০১০ সালের ৯ মে। নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে ২০১০ এর ১৭ জুন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১১ এর ৩০ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ, ২০১২ এর ৫ জানুয়ারি কুমিল্লা, ২০১২ এর ২০ ডিসেম্বর রংপুর ও ২০১৩ এর ৬ জুলাই গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি করপোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০১৩ এর ১৫ জুন। এসব নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর সরকার ও বিরোধী দল-দুই পক্ষই নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ বলে মেনে নেয়।

---

[৪১] *উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮* (২০০৯ সনের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত), ধারা ৪, ৫(২)।

[৪২] *স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯*, ধারা ১৬(১)।

[৪৩] ২০১১ সালের আগে সর্বশেষ পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

[৪৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ ও ৮ ডিসেম্বর ২০১০।

[৪৫] তোফায়েল আহমেদ, 'পৌর নির্বাচনের গতি-প্রকৃতি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ জানুয়ারি ২০১১।

[৪৬] নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মোর্চা ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিবেদন অনুযায়ী কয়েকটি পৌরসভায় বিচ্ছিন্ন কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ছাড়া পৌরসভা নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে (সূত্র: *দ্য ডেইলি স্টার*, ২০ জানুয়ারি ২০১১)।

[৪৭] 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৯' রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ২০০৯ এর ১৫ অক্টোবর।

[৪৮] নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল পৌরসভা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন; রংপুর পৌরসভা নিয়ে রংপুর সিটি করপোরেশন; টঙ্গী ও গাজীপুর পৌরসভা নিয়ে গাজীপুর সিটি করপোরেশন; কুমিল্লা পৌরসভা ও কুমিল্লা সদর দক্ষিণ পৌরসভা নিয়ে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ মার্চ ২০১১)।

বক্স ২: চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন: আচরণ বিধি প্রয়োগের দৃষ্টান্ত

২০১০ এর ১৭ জুন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রথমবারের মতো নির্বাচন কমিশনের একজন নারী কর্মকর্তাকে ১৬ লাখ ৮৮ হাজার ৭৫৪ ভোটারের একটি নির্বাচনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯৪ সালের অনুষ্ঠিত এর আগের নির্বাচনে এ বি এম মহিউদ্দিন বিপুল ভোটে মেয়র নির্বাচিত হন এবং তিনি প্রায় ১৬ বছর ৪ মাস এই পদে দায়িত্ব পালন করেন।

নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনী আচরণবিধির বাস্তবায়নে সক্রিয় ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটরা। শুধু প্রার্থীই নয়, প্রার্থীর যেকোনো সমর্থকও ম্যাজিস্ট্রেটদের নজরদারিতে ছিলেন। আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে যেকোনো স্থানে, যেকোনো মুহূর্তেই জরিমানা করা হয়। সিসিসি নির্বাচনে ম্যাজিস্ট্রেটদের কার্যক্রমের প্রথম দিনেই শাস্তি দেওয়া হয় পাঁচ কাউন্সিলর প্রার্থীর বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থককে; তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানা আদায় করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী এবং হুইপ আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার জন্য চট্টগ্রাম আসেন, তবে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কায় মহানগরীতে কোনো সভা-সমাবেশ করেননি। নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে গ্রেফতার করা হয় বিএনপি দলীয় একজন সংসদ সদস্যকে। তাঁর বিরুদ্ধে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। পরে তিনি "এমন কাজ আর করব না" মুচলেকা দিয়ে মুক্ত হন। নির্বাচনে মেয়র এবং কাউন্সিলর প্রার্থীরা নির্বাচনী আচরণবিধি মানছেন কিনা তা পর্যবেক্ষণ করতে প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন করে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা নীরব পর্যবেক্ষণে নামে। প্রার্থীদের নির্বাচনী আচরণবিধির ওপর কমিশনের কড়াকড়ি থাকায় নির্বাচনী প্রচারণার কলেবর আগের তুলনায় কম পরিলক্ষিত হয়।

নির্বাচনের দিন দু'একটি কেন্দ্রে কমিশনার প্রার্থীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি, হাতাহাতির বিচ্ছিন্ন দু'একটি ঘটনা ছাড়া কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে ভোট গণনার সময় নির্বাচন কন্ট্রোল রুমের বাইরে প্রধান দুই মেয়র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, গুলি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এ সংঘর্ষে দেওয়ানহাট এলাকায় একজনের মৃত্যু হয়। এ সময় বিক্ষোভকারীরা বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে এলে তাদের ওপরও হামলা চালায় সংঘর্ষকারীরা। এ সময় বিক্ষোভকারীরা স্থানীয় একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রিটার্নিং কর্মকর্তা সবাইকে শান্ত হওয়ার জন্য মাইকে বারবার অনুরোধ জানান। সেনাবাহিনী, বিডিআর, র‍্যাব, পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা চালায়। সিসিসি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দাবিতে ইলেকশন কমিশনের নির্বাচন কন্ট্রোল রুমের বাইরে বিক্ষোভ করে বিএনপি সমর্থিত চট্টগ্রাম উন্নয়ন আন্দোলনের মেয়র প্রার্থীর সমর্থকরা। এক পর্যায়ে একজন প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টের সাথে রিটার্নিং কর্মকর্তার বাদানুবাদের পরে ঐ এজেন্ট নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে রিটার্নিং কর্মকর্তা কঠোর হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন।

সূত্র: *প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট, কমিশনের বিভিন্ন প্রেস রিলিজ, জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদ, এবং জানিপপ-এর পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন*

অন্যদিকে ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত সময়সীমা মেনে চলতে পারেনি। ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হয় ২০০২ এর এপ্রিলে। ২০০৭ সালের জুনে এর নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের মেয়াদ শেষ হয়। নির্বাচনী আইন পাশ হওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনকে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু কমিশন উদ্যোগ নিতে নিতে ২০১০ সালের মে মাস চলে আসায় সরকার গরম ও বর্ষা মৌসুম নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত সময় নয় বলে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করার অনুরোধ জানায়, যদিও কমিশনের পক্ষ থেকে তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি চূড়ান্ত ছিল।[৪৯] ২০১০ এর এপ্রিলে তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের উদ্যোগ নিলেও বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ উদ্যোগের অভাব ছিল লক্ষণীয়।[৫০] রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল না বলে অভিযোগ ছিল। পরবর্তীতে বিরূপ সমালোচনার মুখেও 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন ২০০৯' এর ৩(১) ও ৬ অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে উত্তর ও দক্ষিণ - এই দুই ভাগে ভাগ করা হয় ২০১১ এর নভেম্বরে, এবং এর ওপর ভিত্তি করে ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল দুই সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। তফসিল অনুযায়ী ২৪ মে এই নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও একটি আইনি নোটিশের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট এই নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রথমে তিনমাসের জন্য নির্বাচন স্থগিত করা হলেও পরবর্তীতে এর মেয়াদ বাড়িয়ে ছয়মাস করা হয়।[৫১] পরবর্তীতে ২০১৩ সালের ১৩ মে একইসাথে রিট খারিজ করে দেওয়া হয় এবং নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। তবে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচনের আগে করা সম্ভব নয় বলে জানা যায়।

[৪৯] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ এপ্রিল ২০১০।

[৫০] *দ্য ডেইলি স্টার*, ১০ এপ্রিল ২০১২।

[৫১] হাইকোর্ট থেকে নির্বাচন কমিশনকে ভোটার তালিকা হালনাগাদ সম্পন্ন করা ও অন্যান্য আইনি বিষয় নিস্পত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হয় ১৬ এপ্রিল (সূত্র: *দ্য ডেইলি স্টার*, ১৭ এপ্রিল ২০১২)।

৩.১.৬ *জেলা পরিষদ নির্বাচন*

বাংলাদেশের সংবিধানে জেলাকে 'প্রশাসনিক একাংশ'[৫২] হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও জেলা পরিষদের নির্বাচন কখনোই অনুষ্ঠিত হয়নি কারণ জেলা পরিষদ কাগজে-কলমে থাকলেও বাস্তবে অস্তিত্বহীন। অথচ দেশের ৬১টি পরিষদের জন্য প্রতিবছর বাজেটে গড়ে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।[৫৩] ২০০৯ এর নভেম্বরে জেলা পরিষদ নির্বাচনের আয়োজনের চেষ্টা চলছে[৫৪] বলে জানা গেলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। ২০১০ সালের ২৩ জুন অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির একটি সভায় সদস্যরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, কারণ সরকার গঠনের ১৪ মাস পরও 'জেলা পরিষদ বিল' সংসদে উপস্থাপন করা হয়নি। উক্ত সভায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।[৫৫] স্থানীয় সরকারমন্ত্রী জানান 'জেলা পরিষদ আইন ২০০০' সংশোধন করে খসড়া আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।[৫৬] এছাড়া চেয়ারম্যানসহ ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পাঁচ বছর মেয়াদি জেলা পরিষদ গঠনের কার্যক্রম চলছে বলে জানা যায়।[৫৭] তবে জেলা পরিষদের নির্বাচন আয়োজন করার আগেই সরকার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রধানত সরকারি দলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদের নিয়োগ দেয় ২০১১ সালের ১৫ ডিসেম্বর।

৩.২ নির্বাচনী আচরণ বিধি ও তার প্রয়োগ

২০০৭ সালে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আচরণ বিধিতে গুণগত কিছু পরিবর্তন আনার পরও রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছে বলে দেখা যায়।[৫৮] যদিও আইন অমান্য করার জন্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার বিধান রয়েছে, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও ব্যবস্থা না থাকায় ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য যাচাই ও তা প্রদানকারী রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারেনি। নবম জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের দাখিল করা নির্বাচনী ব্যয়ের প্রতিবেদন নিরীক্ষা করার জন্য হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। এখন পর্যন্ত কোনো হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়নি, তবে অভ্যন্তরীণ জনবল দিয়ে প্রাথমিকভাবে কিছু ক্ষেত্রে তথ্য যাচাই করা হয়।

নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচনী আচরণ-বিধি লঙ্ঘন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য টিআইবি নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনা করে সুপারিশ প্রদান করে। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন সংসদীয় নির্বাচনের প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি। তবে পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি ফরম তৈরি করে এবং নির্বাচনী আচরণ-বিধি নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেয়। এর ফলে একটি ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন দেখা যায় পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় উপ-নির্বাচন, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে উল্লিখিত আচরণ-বিধির আলোকে প্রার্থীদের জন্য পৃথক আচরণ বিধি প্রণয়ন করা হয়, এবং তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়। এমনকি আচরণ বিধি লঙ্ঘনজনিত কারণে অনেক প্রার্থী, জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা, সংসদ সদস্য, প্রার্থীর সমর্থকরা বিভিন্ন ধরনের শাস্তি পেয়েছে।

তবে এ বছর অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচন ও সিটি করপোরেশন নির্বাচনগুলোতে আচরণ বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে বলে দেখা যায়, যার মধ্যে নির্বাচনী কাজে সরকারি সার্কিট হাউস ও গাড়ি ব্যবহার, রঙিন বিলবোর্ড ব্যবহার, রাস্তা আটকে জনসভা আয়োজন, নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি কার্যালয় স্থাপন, তোরণ নির্মাণ, প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার, ভোট কেনার অভিযোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রার্থীকে দলীয়ভাবে সমর্থন ও অর্থের বিনিময়ে সমর্থন করার অভিযোগ ওঠে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে শো-কজ করা, জরিমানা করা ও সতর্কতা

---

[৫২] 'প্রশাসনিক একাংশ' অর্থ জেলা কিংবা সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্য কোনো এলাকা।

[৫৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ নভেম্বর ২০০৯।

[৫৪] *দৈনিক সমকাল*, ৩ মে ২০০৯।

[৫৫] *ইন্ডিপেনডেন্ট*, ২৪ জুন ২০১০।

[৫৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩ মার্চ ২০১১।

[৫৭] *প্রথম আলো*, ২৪ মার্চ ২০১১। ২০১১ এর ২৩ মার্চ সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী এ তথ্য জানান।

[৫৮] শাহজাদা আকরাম ও সাধন কুমার দাস, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা: প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ওপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ*, টিআইবি, ২০১০। এই গবেষণায় দেখা যায়, মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রার্থীরা গড়ে ৪৪ লাখ ২০ হাজার ৯৭৯ টাকা ব্যয় করে, যা নির্ধারিত ব্যয়সীমার চেয়েও গড়ে ৩১ লাখ ৫ হাজার ৮৫৯ টাকা অতিরিক্ত। এর বাইরেও পোস্টার সাঁটানো, ভোট কেনা, সংখ্যালঘু ভোটারদের ভয়-ভীতি দেখানো, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার, প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার, গাড়ি, মাইক্রোবাস ও মোটর সাইকেল ব্যবহার করে শোভাযাত্রা ও মনোনয়ন পাওয়ার পর আনন্দ মিছিল, অনুমোদিত সময় ও সংখ্যার অতিরিক্ত মাইকের ব্যবহার, ব্যানার ও ফেস্টুন ব্যবহার, নির্বাচনী প্রচারণায় অপ্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের ব্যবহার ইত্যাদি ধরনের আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা হয়।

নোটিশ পাঠানো হয়। তবে এসব নির্বাচনে আচরণ বিধি ভঙ্গের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণে নির্বাচন কমিশনের সক্রিয়তার ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার আগে থেকেই সম্ভাব্য প্রার্থীদের ব্যাপকভাবে প্রচারণা শুরু করেন। তবে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, বরং প্রধান নির্বাচন কমিশনার একে নির্বাচনী আমেজ বলে অভিহিত করেন। নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের শিথিল ভাব সমালোচিত হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন সরিয়ে নিতে নোটিশ জারি করে। সম্প্রতি রাজধানী ঢাকায় প্রায় দুই হাজার বিলবোর্ড দখল করে সরকারের সাফল্য প্রচার করা হয়, যা দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে করা হয়েছে বলে জানা যায়। এক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশনের কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

৩.৩ ভোটার তালিকা: নতুন ও হালনাগাদ

২০০৬-০৭ সালের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ভেঙে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ভোটার তালিকার ত্রুটি এবং এর প্রতি ভোটারদের অনাস্থা। তৎকালীন নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের আগে আইন অনুযায়ী বারে বারে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অভিপ্রায় এবং গণমাধ্যমে ভোটার তালিকা প্রণয়নের বিভিন্ন দুর্বলতা ও ত্রুটি প্রকাশিত হওয়ায় সর্বমহলে নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অনাস্থা ও অবিশ্বাস তৈরি হয়। একটি প্রাক্কলনে দেখা যায় হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকার ত্রুটির কারণে এক কোটির বেশি ভোটারের নাম একাধিকবার এসেছে।[৫৯]

ভোটার তালিকা নিয়ে সৃষ্ট সংকটের সমাধানের জন্য ভোটার পরিচয় পত্র চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়। এই উদ্যোগের পাশাপাশি সম্পূরক আর একটি উদ্যোগ সামরিক বাহিনী গ্রহণ করে। ২০০৭ এর ৫ মার্চ টেকনিক্যাল কমিটি নয় কোটি মানুষের জন্য একটি ভোটার পরিচয় পত্র প্রণয়নের ধারণা দেয়, যার জন্য খরচ প্রাক্কলন করে প্রায় ৩৮৫ কোটি টাকা। 'ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২' মোতাবেক হাইকোর্ট ২০০৭ এর ২৭ মার্চ নির্বাচন কমিশনকে ২০০০ সালের ভোটার তালিকাটি হালনাগাদ করার আদেশ দেয়। কিন্তু ছবিযুক্ত নতুন ভোটার তালিকা তৈরি করায় নির্বাচন কমিশন 'ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ২০০৭' নামে নতুন একটি আইনের খসড়া করে যা তত্ত্বাবধায়ক সরকার সামান্য পরিবর্তন করে এবং ৯ আগস্ট তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়।

এই সময় নবগঠিত নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজটি তাঁদের প্রধান কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। তাঁদের নিয়োগের একমাসের মধ্যে তাঁরা পুরনো ভোটার তালিকা সংশোধন করা সম্ভব নয় বলে ছবিযুক্ত নতুন ভোটার তালিকা তৈরির কথা ঘোষণা করেন। এ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ শলা-পরামর্শের পর ২১ মার্চ নির্বাচন কমিশন ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির কথা ঘোষণা করে, এবং জাতীয় পরিচয় পত্রের ধারণা দেয়। ৫ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন ১৮ মাস মেয়াদি একটি কর্ম-পরিকল্পনা দেয়, যেখানে প্রথম ছয় মাস প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, যন্ত্রপাতি কেনা ও কর্মী নিয়োগ এবং বাকি ১২ মাস মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পরিকল্পনা ছিল। বিভিন্ন ধাপে আলোচনার মাধ্যমে নতুন ভোটার তালিকা তৈরির সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে এবং প্রকল্প খরচ কমিয়ে সামরিক বাহিনীর প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা হয়। ২০০৭ এর ৫ মে নির্বাচন কমিশন সামরিক বাহিনীর সাথে একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির টেকনিক্যাল ও আর্থিক সহায়তায় 'প্রিপারেশন অব ইলেকটোরাল রোলস উইথ ফটোগ্রাফ (পিইআরপি)' প্রকল্প গ্রহণ করে ২০০৭ এর ২৭ আগস্ট।

তবে পুরোদমে ভোটার তালিকার কাজ শুরু করার আগে ২০০৭ সালের ১০ জুন গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি পাইলট করা হয়। এরপর সামরিক বাহিনী 'অপারেশন নবযাত্রা' নামে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির কাজ শুরু করে। ২০০৮ এর ২২ জুলাই ১১ মাসে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ৭২৩ ভোটারের ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। এই প্রকল্পের কাজে ১০,০৫০টি ল্যাপটপ কম্পিউটার, ১২,০০০টি ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার, ৩,২৯০টি জেনারেটর, ৬৩৪টি প্রিন্টার, ৯,০০৪টি ওয়েব ক্যামেরা এবং ৫৯০টি সার্ভার ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। এ প্রকল্পে সামরিক বাহিনীর ১৫,০০০ সদস্য, নির্বাচন কমিশনের ২,৫০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী, ৪,৮২,৮৮০ তথ্য সংগ্রাহক এবং ১,০৪,০২৫ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, প্রুফ রিডার ও সুপারভাইজার নিয়োজিত ছিল। এবারই প্রথমবারের মতো উচ্চ আদালতের রায়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশে বসবাসরত 'আটকেপড়া পাকিস্তানী' নামে

[৫৯] যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) এর প্রাক্কলনে বলা হয় ২০০৬ সালের হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকায় প্রায় ১.২২ কোটি ভোটার রয়েছে যাদের নাম তালিকায় একাধিকবার এসেছে (সূত্র: *দ্য ডেইলি স্টার*, ৩ ডিসেম্বর ২০০৬)।

পরিচিত জনগোষ্ঠীকে ভোটার করা হয়, যে উদ্যোগ এর আগের কোনো নির্বাচন কমিশন নেয়নি। এই কমিশনের উদ্যোগে প্রবাসী বাংলাদেশী, এবং ছিটমহলবাসীদেরও ভোটার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

পরবর্তীতে ৪৬.৮৯ লাখ নতুন ভোটারকে ছবিসহ ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়। এছাড়াও তাদের জাতীয় পরিচয় পত্র দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশন ২০১১ সালের ২১ আগস্ট উন্নত মানের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ডাটাবেজ ও নেটওয়ার্ক তৈরি সংক্রান্ত প্রকল্পের (আইডেন্টিফিকেশন ফর এনহান্সড অ্যাক্সেস টু সার্ভিসেস – আইডিয়া) জন্য বিশ্বব্যাংকের সাথে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকার ঋণচুক্তি করে।[৬০]

বর্তমান নির্বাচন কমিশন ২০১২ এর ১০ মার্চ থেকে সারাদেশে ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ কর্মসূচি শুরু করে। চার পর্যায়ে এ কর্মসূচির আওতায় যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য হয়েছে, তালিকাভুক্ত যারা মারা গেছে, যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যারা পূর্বে ভোটার হতে পারেনি, এবং যেসব ভোটার স্থানান্তর করেছে তাদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। হালনাগাদ শেষে ২০১৩ এর ৩১ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। বর্তমান ভোটার তালিকায় মোট ভোটার ৯,২১,২৯,৮৫২ জন (পুরুষ ৪,৬২,০১,৮৭১; নারী ৪,৫৯,২৭,৯৮১)।[৬১] তবে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজে কোনো কোনো এলাকায় অনিয়মের (যেমন প্রতি বাড়িতে না যাওয়া, হালনাগাদের কাজে দীর্ঘসূত্রতা) অভিযোগ পাওয়া যায়।[৬২]

৩.৪ নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ

প্রতিটি আদমশুমারির পর সংসদীয় এলাকার সীমানা নতুন করে নির্ধারণ করার বিধান রয়েছে। ১৯৮৪ সালে পরিদর্শনের মাধ্যমে আসন পুনর্বিন্যাস করা হলেও ১৯৯১ সালে তা আংশিক করা হয়, এবং ২০০৮ এর নির্বাচনের আগে কোনো নির্বাচনেই সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়নি। এই নির্বাচনের সময় আসনপ্রতি ভোটারের ব্যাপক বৈষম্য দেখা দেয় – কোনো আসনে ছয় লাখের ওপর, আবার কোনো আসনে ভোটার এক লাখের সামান্য বেশি। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশন তাদের নির্বাচনী সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অত্যন্ত জটিল এই সমস্যার সমাধানে কার্যকর একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। নির্বাচন কমিশনের রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০০৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়।

'সীমানা পুনর্নির্ধারণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬' অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন ২০০১ সালের আদমশুমারির তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এবং প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধা চিন্তা করে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে। ২০০৮ এর ২৯ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন ১৩৩টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে তা প্রকাশ করে এবং ১ জুনের মধ্যে জনগণের মতামত চায়। এ কাজে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি সহায়তা দেয়। এ কাজে একটি জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমস (জিআইএস) প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞকে নিয়োজিত করা হয়। তবে এ প্রক্রিয়ায় প্রায় সবগুলো রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। ২০০৮ সালের ৬ জুনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন প্রায় ৩,০০০টি অভিযোগ গ্রহণ করে এবং ১২ থেকে ২৯ জুনের মধ্যে গণ শুনানি করার ঘোষণা দেয়। ছয়টি বিভাগে এবং কুমিল্লা জেলায় (এই জেলায় অধিক সংখ্যক অভিযোগ পাওয়া যায়) গণ শুনানি করা হয়। এই শুনানির ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন ১৩৩টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ৮৪টির পুনর্বিন্যাস করে এবং ১০ জুলাই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঢাকা জেলার আসন সংখ্যা ১৩টি থেকে বেড়ে ২০টি হয়।

বর্তমান নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণ সম্পর্কে মতামত গ্রহণের জন্য ২০১২ এর ২৬ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ আয়োজন করে। এই সংলাপের ওপর ভিত্তি করে ২০১৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের ৮৪টি আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করে খসড়া গেজেট প্রকাশ করে, যার ওপর ২৩ এপ্রিল থেকে ১২ মে পর্যন্ত শুনানি সম্পন্ন হয়। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চূড়ান্তভাবে ৫৩টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে আগস্টের ২৯ তারিখে আসনভিত্তিক ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করে নির্বাচন কমিশন। এই তালিকা অনুযায়ী ২৪টি সংসদীয় এলাকার

---

[৬০] এই অর্থের মধ্যে শোভন এনআইডি মুদ্রণ ও বিতরণে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৭৮৭ কোটি টাকা। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাত হলো, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০১ কোটি টাকা, যন্ত্রপাতি কেনা ৯৪ কোটি টাকা, ভোটারদের ঘরে শোভন এনআইডি পৌঁছানো বাবদ ৯০ কোটি টাকা, উপজেলার সঙ্গে কেন্দ্রের আন্তসম্পর্ক তৈরিতে ৪৪ কোটি টাকা, সফটওয়্যার কেনা ৩২ কোটি টাকা এবং কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ২২ কোটি টাকা।

[৬১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

[৬২] দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ জানুয়ারি ২০১৩, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১২।

ভোটার সংখ্যা চার লাখের ওপরে, এবং ১৪টি এলাকার ভোটার সংখ্যা দুই লাখের নিচে।[৬৩] উল্লেখ্য, নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণে কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ওঠে সরকার ও বিরোধিদলীয় সংসদ সদস্যদের পক্ষ থেকেই, যেমন ঢাকার নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে সরকারদলীয় কয়েকজন সংসদ সদস্য পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করেন, এবং কুমিল্লা-১০ আসনের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধিদলীয় একজন সাবেক সংসদ সদস্যের করা একটি রিটের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনের জারি করা গেজেট কেন অবৈধ হবে না তা জানতে চেয়ে হাইকোর্ট রুল জারি করেন ২৯ জুলাই।[৬৪]

৩.৫ প্রার্থী ও দলের হিসাব নিরীক্ষা ও তথ্য প্রকাশ

প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলের অর্থায়নের তদারকি এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন, ২০০৯ এবং 'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯' এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত। আইন অনুযায়ী অনুযায়ী নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত হিসাব সকল রশিদ এবং বিলসহ প্রতিদিন অর্থ পরিশোধের একটি বিবরণীসহ নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে হবে।[৬৫] প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।[৬৬] এছাড়া 'রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৯' অনুসারে প্রধানত রাজনৈতিক অনুদান গ্রহণ ও নির্বাচনে ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, এবং সার্বিকভাবে রাজনৈতিক অর্থায়নকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯' অনুসারে রাজনৈতিক দলগুলোকেও তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব নির্বাচন কমিশনে দাখিল করতে হয়। এছাড়াও আইন অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরের শেষে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে রেজিস্টার্ড চার্টার্ড অ্যাকাউন্টিং ফার্ম দ্বারা নিরীক্ষা করিয়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কপি নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা দলগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রত্যেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে আট-দফা বিশিষ্ট হলফনামা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। এবং নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নেয়। ফলে প্রত্যেক প্রার্থী তাদের ব্যক্তিগত আটটি বিষয়ে তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়। পরবর্তী নির্বাচন কমিশন এসব তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। তবে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের কোনো ব্যবস্থা না থাকার ফলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা যথার্থভাবে প্রয়োগ করতে পারেনি, এবং এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করেনি।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল এবং প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রার্থী তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জমা দেয়।[৬৭] তবে যেসব প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা দেয়নি তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা গ্রহণে শৈথিল্য লক্ষ করা যায়।[৬৮] একইভাবে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।[৬৯]

অন্যদিকে দেখা যায় বড় রাজনৈতিক দলগুলো ধীরে ধীরে দলের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দেওয়ার চর্চা মেনে চলছে। নির্বাচনের পর প্রথম বছরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিসহ ২২টি দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (২০১০ এর ৩১ জুলাই) তাদের দলের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ আরও ১৬টি দল তাদের বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন বর্ধিত সময়সীমা ২০১০ এর ৩০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে

[৬৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ আগস্ট ২০১২।

[৬৪] দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩১ মার্চ, ৩০ জুলাই ২০১৩; *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৪ এপ্রিল ২০১৩।

[৬৫] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ৪৪গ।

[৬৬] *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯*, ধারা ৪৪ঘ (৩)।

[৬৭] নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ২০০৯ এর ৩১ জানুয়ারি'র মধ্যে ২৯৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ১,৫৫৫ জন প্রার্থীর ৭৫.৬৩% নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট সময়ে দাখিল করেন (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ এপ্রিল ২০০৯)। এছাড়া ২০০৯ এর ৩১ মার্চ এর মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৯টি রাজনৈতিক দল তাদের ব্যয়ের রিটার্ন জমা দেয় (সূত্র: *দ্য ডেইলি স্টার*, ১২ এপ্রিল ২০০৯)।

[৬৮] যেসব প্রার্থী নির্দিষ্ট সময়ে রিটার্ন জমা দেয়নি তাদের ৩০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। ২০০৯ এর ৭ অক্টোবর পর্যন্ত ১১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। যেসব প্রার্থী সময়মত হিসাব জমা দেয়নি তাদের নাম নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেনি।

[৬৯] নির্দিষ্ট সময়ের (৩১ মার্চ) মধ্যে যেসব দল নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব জমা দেয়নি তাদের জন্য ২০১০ সালে এক মাস এবং ২০১১ সালে দেড় মাস সময় বাড়ানো হয়। ২০১০ সালে নির্বাচন কমিশন বিএনপিসহ ১১টি দলের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব অসম্পূর্ণ বলে চিহ্নিত করে এবং তাদেরকে আবার হিসাব দেওয়ার জন্য চিঠি পাঠায়।

জমা দেয়।[৭০] ২০১১ সালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (২০১১ এর ৩১ জুলাই) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ ২১টি দল তাদের নিরীক্ষাকৃত বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনে জমা দেয়, এবং বিএনপিসহ দশটি দল দুই মাস সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করে।[৭১] পরবর্তীতে বিএনপিসহ ১৩টি দল বর্ধিত সময়সীমার (১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১) মধ্যে বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেয়।[৭২] ২০১২ সালে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (২০১২ এর ৩১ জুলাই) আওয়ামী লীগ ও বিএনপিসহ ৩১টি দল হিসাব জমা দেয় এবং বাকি দলগুলো হিসাব জমা দেওয়ার সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করে।[৭৩] এ বছর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (২০১৩ এর ৩১ জুলাই) প্রধান দলগুলোসহ ২৭টি দল হিসাব জমা দিয়েছে, এবং বাকি দশটি দল হিসাব জমা দেওয়ার জন্য সময় বাড়ানোর আবেদন করেছে।[৭৪]

তবে এখন পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের জমা দেওয়া বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেনি। টিআইবি'র একটি গবেষণা (২০১০) থেকে দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলো সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করে না এবং তাদের দাখিলকৃত হিসাবে অনুদান এবং ঋণ সংক্রান্ত তথ্য সবসময় অন্তর্ভুক্ত থাকে না। প্রকৃতপক্ষে তাদের জমা দেওয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পূর্ণ নয়, এবং রাজনৈতিক দলের অর্থ প্রবাহ পরিবীক্ষণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কোনো টেকসই কার্যকর ব্যবস্থা নেই। এছাড়া কমিশন এসব হিসাব কোনো বছরেই নিরীক্ষা করেনি।

৩.৬ উপসংহার

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন আয়োজন করে। এসব নির্বাচন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সব মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। নির্বাচন কমিশন প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল না থেকে পর্যায়ক্রমে নিজস্ব জনবল দিয়ে এসব নির্বাচন আয়োজন করে। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে সরকার ও প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হয়। কমিশনের উদ্যোগে নির্বাচনী আচরণ বিধিতে গুণগত কিছু পরিবর্তন আনার পরও জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছে বলে দেখা যায়। তবে কমিশনের পক্ষ থেকে আচরণ বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা ছিল।

নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নবম জাতীয় নির্বাচনের জন্য ছবিসহ নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, যা পরবর্তীতে বর্তমান কমিশনের দ্বারা হালনাগাদ করা হয়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ২০০৮ সালে সংসদীয় এলাকার সীমানা নতুন করে নির্ধারণ, যা বর্তমান কমিশন ২০১৩ সালে আবার সম্পন্ন করেছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ এবং নির্বাচনের পর প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী প্রকাশ নির্বাচন কমিশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। তবে রাজনৈতিক দলের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের তথ্য নির্বাচন কমিশনে নিয়মিত জমা হলেও এ সংক্রান্ত তথ্য কমিশন প্রকাশ করেনি।

---

[৭০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১০।
[৭১] *দ্য ডেইলি স্টার*, ১ আগস্ট ২০১১।
[৭২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১১।
[৭৩] *দৈনিক যুগান্তর*, ১ আগস্ট ২০১২।
[৭৪] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ আগস্ট ২০১৩।

অধ্যায় চার

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

দেশের সংবিধান ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইনের বিধান অনুসারে নির্ধারিত সময় অন্তর অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যক্ত করছে। ২০০৭ সালে পুনর্গঠনের পর থেকে নির্বাচন কমিশন তার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়। এ অধ্যায়ে এসব কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৪.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

নির্বাচন কমিশনের সার্বিক কাজের গুণগত মান উন্নয়ন, কর্মীবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে কমিশনের কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রিকরণ ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে কমিশনের সেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, অধীনস্থ দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়গুলোর একটি ব্যাপক ও বহুমুখী সাংগঠনিক পর্যালোচনা সম্পন্ন করা হয়। পরে ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট ও সুপারিশমালা কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কমিশন সচিবালয়, অধীনস্থ দপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহের মৌলিক পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের একটি প্রস্তাবনা তৈরি করা হয়।

'নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯'-এর ১৭ ধারার অধীনে নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সহযোগে গঠিত সাংগঠনিক কমিটিতে এসব প্রস্তাব পেশ করা হলে কিছু সংশোধনীসহ তা সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। সরকার ঐ প্রস্তাব পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়, অধীনস্থ দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সংগঠন, জনবল ও সরঞ্জামাদির পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস অনুমোদন করে ২০১১ সালের ১৬ অক্টোবর। আন্তঃদপ্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের কাজ দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে নিষ্পন্নের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান সংস্কার ও পুনর্গঠন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

৪.১.১ একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনা

'নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধি, ২০০৯' জারি করার আগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়কে জনবল প্রশাসনের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধারা হিসেবে পরিগণিত হত। উভয় ধারার শুরুর পদ যেমন ছিল ভিন্ন, তেমনি পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোটা প্রয়োগে বিভিন্ন ফিডার পদের সংখ্যার ভারসাম্য ছিল না (আকরাম ও দাস, ২০০৬)। সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক বিভাজনের ফলে একই সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেমন সমতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছিল না, তেমনি চাকরিতে প্রবেশকালে প্রাপ্ত তাদের আন্তঃজ্যেষ্ঠতাও অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব ছিল না। যার যার নিজস্ব অধিক্ষেত্রে বদলি ও পদায়ন সীমাবদ্ধ থাকার কারণে মাঠ পর্যায় ও সচিবালয়ের পারস্পরিক কাজের অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছিল না। যার ফলে নির্বাচন কমিশনের সার্বিক কর্মদক্ষতা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল।

এসব অসুবিধা দূর করার জন্য এই দুই ধারাকে একীভূত করে একটি অভিন্ন ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ২০০৮ সালে বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালা বাতিল করে নতুন বিধিমালা কার্যকর করা হয়। 'নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগবিধি, ২০০৯' অনুযায়ী এই বিভাজন পরিহার করে উভয় অঙ্গকে একীভূত করা হয়।[৭৫] দীর্ঘদিন ধরে দুটি ভিন্ন ধারায় পৃথকভাবে নিয়োগ ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ শ্রেণীতে একটি সম্মিলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়ন করা অপরিহার্য ছিল যেটির ভিত্তিতে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি বিবেচনা করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে একক কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের মধ্যে আন্তঃপদায়ন ও সম্মিলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকার ভিত্তিতে পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৪.১.২ নিয়োগ

নির্বাচন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন এনে বাস্তবতার আলোকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। এ আলোকে প্রথম শ্রেণীর ৭৮০টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৪৬টি, তৃতীয় শ্রেণীর ৯৮৬টি এবং চতুর্থ শ্রেণীর ৯৩২টি নতুন পদ সৃষ্টির কার্যক্রম ২০১০ এর

[৭৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, প্রজ্ঞাপন (নং নিকস/প্র-১/সাকা/১(৬)/৮৬(অংশ-৪)/৭৮৩), ১৬ অক্টোবর ২০১১।

নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ১৫৪টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঁচটি, তৃতীয় শ্রেণীর ১৫১টি এবং চতুর্থ শ্রেণীর ১১৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনের কাজে গতিশীলতা আনার জন্য মাঠ পর্যায়ে বিভাগীয় নয়টি পদ এবং জেলা পর্যায়ের ১৯টি পদকে উন্নীতকরণ করা হয়। তবে এসব নিয়োগের পরও সব পদের বিপরীতে কর্মকর্তা-কর্মচারী এখনো নেই।

২০১২ এর জুন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ১৭৪ জন ও তৃতীয় শ্রেণির ৪০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অফিস সহকারী, উচ্চমান সহকারী, নিম্নমান সহকারী, এমএলএসএস এবং হিসাব সহকারী পদে অনেকগুলো নিয়োগ হওয়ায় মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে জনবলের স্বল্পতা কমেছে। তবে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার ৮৫টি পদের বিপরীতে হাইকোর্টে মামলা থাকায় এসব পদে জনবলের অভাব রয়েছে।[৭৬] এসব পদের দায়িত্ব পার্শ্ববর্তী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে পালন করছে, অথবা উপজেলা অফিসের নিম্ন পদাধিকারীরা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাজ করছে।

৪.১.৩ পদোন্নতি

নির্বাচন কমিশনে দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা ছিল। এ সমস্যার সমাধানে পূর্ববর্তী কোনো কমিশনই কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আজিজুল হক কমিশনের প্রতিবেদনে এ সমস্যা হতে উত্তরণের সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়।[৭৭]

এ প্রেক্ষিতে সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একক নেতৃত্বে পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতার সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। জ্যেষ্ঠতার তালিকা তৈরির জন্য ২০০৯ সালের ১৫ জুলাই তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি করা হয়। এই কমিটি যোগদানের তারিখ ধরে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করে তার প্রতিবেদন ও তালিকা জমা দেয় ২০০৯ এর ১৮ আগস্ট। তবে নির্বাচন কমিশন এই তালিকা গ্রহণ না করে ২০০৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর একটি নীতিমালা তৈরি করে প্রজ্ঞাপন জারি করে, যেখানে বলা হয় সিনিয়র স্কেলপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জ্যেষ্ঠতা ঐ স্কেল প্রাপ্তির তারিখ থেকে গণনা করা হবে। এই নীতির ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন আরেকটি তালিকা তৈরি করে যেখানে চারজন কর্মকর্তা যারা কমিটির তালিকায় অনেক পেছনে ছিলেন তাদেরকে এই নীতির ভিত্তিতে ওপরের দিকে দেখানো হয়, এবং তাদেরসহ দুই জন যুগ্মসচিব, নয়জন ডেপুটি সচিব এবং প্রায় ৫০ জনকে উপজেলা নির্বাচন অফিসার থেকে জেলা নির্বাচন অফিসার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় ২০১১ সালের ৪ অক্টোবর। এর মধ্যে মাঠ পর্যায় থেকে নয়জন ডেপুটি সচিব পদে পদোন্নতি পান।

উল্লেখ্য, কমিটির তালিকা তৈরির পর প্রায় ২২ মাস পদোন্নতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি, বর্তমান তালিকার খসড়া আগে প্রকাশ করা হয়নি, এবং পদোন্নতিপ্রাপ্তদের কোনো চিঠিও দেওয়া হয়নি। এই পদোন্নতির পর ২০১২ সালের জানুয়ারির মধ্যে এ সংক্রান্ত অভিযোগ লিখিতভাবে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়। পরবর্তীতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা এই পদোন্নতির বিরোধিতা করে মামলা দায়ের করেন যার ভিত্তিতে সংক্ষুব্ধ কর্মকর্তারা আদালতের নির্দেশ পেয়েছেন, এবং পরবর্তীতে এ বিষয়ে শুনানি চলবে। নির্বাচন কমিশনও তাদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ করেছে। যেহেতু আদালতের একটি নির্দেশ আছে, পদোন্নতি সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে আদালতের কোনো নির্দেশ থাকলেও পদোন্নতির প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত স্থগিত হবে না। তবে আদালত চূড়ান্ত রায়ে যদি পদোন্নতির প্রক্রিয়াটিকে অবৈধ ঘোষণা করে তখন এসব পদোন্নতি বাতিল হয়ে যাবে। তারপরও এখনো মাঠ পর্যায়ের অনেক কর্মকর্তা পদোন্নতি হতে বঞ্চিত রয়েছেন বলে দেখা যায়, যার ফলে তাদের আন্তরিকতা ও পেশাগত কর্মদক্ষতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে কর্মকর্তারা জানান। তাই বিভিন্ন সময়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

৪.২ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে বেশ কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪.২.১ নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবন

ইলেকশন রিসোর্স সেন্টার (ইআরসি) প্রকল্পের আওতায় ঢাকার আগারগাঁও-এ ২.৩৬ একর জমি বরাদ্দসহ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের জন্য ১১ তলাবিশিষ্ট ও ১২ তলাবিশিষ্ট নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণের বিষয়টি এখন প্রক্রিয়াধীন।

---

[৭৬] উল্লেখ্য, ২০০৫ সালে ৩২৮ জন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। সে সময় রাজনৈতিক বিবেচনায় তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে নতুন নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নিয়ে এসব কর্মকর্তার নতুন করে মূল্যায়ন পরীক্ষার আয়োজন করে যেখানে ৮৫ জন অকৃতকার্য হয়, এবং ঐ বছরের ৩ সেপ্টেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এসব কর্মকর্তা আদালতে মামলা দায়ের করে এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ে ২০০৯ সালের শেষ দিকে চাকরি ফিরে পায় (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ মে ২০০৯)।

[৭৭] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আকরাম ও দাস (২০০৬)।

৪.২.২ স্থানীয় পর্যায়ে সার্ভার স্টেশন

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আওতাধীন 'কনস্ট্রাকশন অব উপজেলা অ্যান্ড রিজিওনাল সার্ভার স্টেশনস ডাটাবেজ' প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য নয়টি রিজিওনাল ও ৫৪টি জেলা সার্ভার স্টেশন ভবনের জন্য জমি অধিগ্রহণ/ হস্তান্তর/ বন্দোবস্ত কিংবা ব্যবহারে অনুমতি প্রদানে দীর্ঘসূত্রতা নির্মাণ কাজ ব্যাহত করছে। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন/ মন্ত্রণালয়ের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে এ প্রকল্পের আওতায় গত দুই বছরে মোট ৩৯৬টির মধ্যে ৩৮৩টি উপজেলা সার্ভার স্টেশন ভবন নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়া হয়, যার মধ্যে ৩৭০টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকিগুলো নির্মাণাধীন।[৭৮] প্রতিটি উপজেলা সার্ভার স্টেশন দুই তলাবিশিষ্ট। নিচতলায় গোডাউন আর দ্বিতীয় তলায় রয়েছে উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও অফিস সহকারীর কক্ষ এবং সার্ভার রুম।

তবে মাঠ পর্যায় থেকে জানা যায় উপজেলা পর্যায়ে পরিবহন ব্যবস্থা ভাল না থাকার কারণে আইডি কার্ডের জন্য তদন্ত করা, যারা দেশের বাইরে থাকেন বা যারা দেশের বাইরে যাবেন তাদের বিষয়ে তদন্ত করা ইত্যাদি কাজের জন্য মোটর সাইকেল খুবই জরুরি। সম্প্রতি ১৯টি জেলা কার্যালয়ে জীপ ও ৩০০ উপজেলা কার্যালয়ে মোটর সাইকেল দেওয়া হয়েছে।[৭৯] এছাড়া অফিস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে মাত্র ২,৫০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।[৮০]

৪.৩ নির্বাচন অনুষ্ঠানে এবং অফিস কার্যক্রমে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার

নির্বাচন কমিশন নির্বাচন আয়োজন এবং নিয়মিত কার্যক্রমে নতুন প্রযুক্তির প্রচলন করেছে।

- **ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম):** ইতোমধ্যে নির্বাচনে ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের একটি ওয়ার্ডে ক্ষুদ্র পরিসরে ইভিএম-এর ব্যবহারের মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। এরপর নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে নয়টি ওয়ার্ডে ইভিএম-এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়। এরপর কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচন এবং নরসিংদী পৌরসভার মেয়র পদের নির্বাচনে শতভাগ ইভিএম-এর মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হয়। তবে সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলোতে ইভিএম ব্যবহার থেকে নির্বাচন কমিশন সরে এসেছে বলে দেখা যায়। প্রধান বিরোধী দলের অব্যাহত আপত্তির কারণে দশম জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে না বলেও নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।[৮১]
- **ওয়েব ক্যামেরা ও এসএমএস:** কুমিল্লা সিটি করপোরেশন এবং নরসিংদী পৌরসভার মেয়র নির্বাচনে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ওয়েব ক্যামেরা এবং নিজস্ব পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়। প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকায় ইভিএম-এর ব্যবহার এবং নিয়ম-কানুনের ওপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্র থেকে মোবাইল ফোনের খুদে বার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে ঐ কেন্দ্রের ফলাফল নির্বাচন কমিশন কাছে এবং রিটার্নিং অফিসারের কাছে পাঠানো হয়।
- **অফিস কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার:** মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের সাথে ইন্ট্রানেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন কার্যালয়েও ল্যাপটপ কম্পিউটার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, স্ক্যানার এবং ইন্ট্রানেট মডেম রয়েছে।
- **ওয়েবসাইট হালনাগাদ:** নির্বাচন কমিশনের সব প্রয়োজনীয় তথ্য ইন্টারনেট-এ প্রকাশ করা হচ্ছে। পূর্বের ইংরেজি ওয়েবসাইটের উন্নয়নের পাশাপাশি ২০০৮ এর ২০ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনের বাংলা ওয়েবসাইট (http://www.ecs.gov.bd/Bangla/) উদ্বোধন করা হয়, যেখানে ইউনিকোডভিত্তিক বাংলা ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে এবং সকল তথ্যের একটি বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে। ফলে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাওয়া অনেক সহজ হয়েছে। তবে উল্লেখ্য, এখনো নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে নির্বাচন সম্পর্কিত তথ্য হালনাগাদ করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কিশোরগঞ্জ-৪ উপ-নির্বাচন বা চারটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়নি। এছাড়া কোনো কোনো তথ্য যেমন পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী আসনের ভোটারসংখ্যাসহ তালিকা, নির্বাচনী মামলা, নির্বাচন কমিশন আয়োজিত সংলাপের ফলাফল বা সারাংশ, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সার্বিক তথ্য, নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন, নির্বাচন কমিশনের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট, বিস্তারিত বাজেট, বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসহ সকল আর্থিক দলিল ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় না।
- **ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার:** ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদানে সহায়তা দান প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ১০,০৫০ ল্যাপটপ কম্পিউটার, ১২,০০০ ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার, ৩২৯০টি জেনারেটর,

---

[৭৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, 'বর্তমান সরকারের বিগত তিন বছরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে অর্জন বিষয়ক প্রতিবেদন', ২৭ জুন ২০১২।

[৭৯] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

[৮০] নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার।

[৮১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ আগস্ট ২০১২।

৬৩৪টি প্রিন্টার, ৯০০৪টি ওয়েব ক্যামেরা এবং ৫৯০টি সার্ভার ডেস্কটপ কম্পিউটার নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়সহ আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ব্যবহারে জন্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া 'ট্রান্সলুসেন্ট ব্যালট বাক্স' প্রকল্পের আওতায় এ সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত ২৫,০০০ স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স এবং আট লক্ষ সীল সংগ্রহ করা হয়।

৪.৪ প্রশিক্ষণ

গত নির্বাচন কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদে অনেকগুলো প্রাতিষ্ঠানিক এবং নির্বাচনী সংস্কার করেছে, যা বাস্তবায়ন করার জন্য নির্বাচন কমিশন তার কর্মী বাহিনীকে নিজস্ব ইলেকটোরাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ইটিআই)-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করেছে। ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজে নির্বাচন কমিশনের প্রায় ২,৫০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষিত করে তাদের কাজে লাগানো হয়। ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে নির্বাচন পূর্ববর্তী বা নির্বাচনকালীন বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। ইটিআই-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালে এক লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৭ জনকে প্রশিক্ষিত করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনাররা নিয়মিত এসব প্রশিক্ষণ অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতেন। আবার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা নির্বাচন সম্পর্কিত 'গুড প্র্যাকটিস' জানার জন্য অন্যান্য দেশে গিয়েছেন এবং ফিরে এসে তা দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থায় কাজে লাগিয়েছেন। তবে বিদেশে প্রশিক্ষণে যাওয়া বা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুটিকয়েক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়নি) বারবার সুযোগ পান বলে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা যায়।

৪.৫ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সাবেক নির্বাচন কমিশনারগণ ও নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা নির্বাচন কমিশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা জানান সরকারের কাছ থেকে নির্বাচন কমিশন যথাযথ পরিমাণে ও যথাযথ সময়ে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ পেয়েছেন। জাতীয় বাজেটে চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনের জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা হয়। ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায় নির্বাচন কমিশনের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের চেয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যয় কম হয়েছে।[৮২]

নির্বাচন কমিশনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল রাজস্ব খাতের বাইরেও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো। যেসব প্রকল্প ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে বা প্রক্রিয়াধীন সেগুলো হচ্ছে:

- **ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত (পিইআরপি) প্রকল্প:** জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এই প্রকল্পে ৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দেয় উন্নয়ন সহযোগীরা, বাকি ২৯ মিলিয়ন ডলার দেয় বাংলাদেশ সরকার।[৮৩]
- **জাতীয় নির্বাচন কর্মসূচি (এনইপি) প্রকল্প:** এশিয়া ফাউন্ডেশন সমন্বিত প্রকল্পে নয়টি দাতা সংস্থা[৮৪] ৯.৩ মার্কিন ডলার তহবিল দেয়। এই প্রকল্পের অধীনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ-সহায়তা দেওয়া হয়, এবং ভোটার তালিকা তৈরি এবং ভোটার সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়।
- **কনস্ট্রাকশন অব উপজেলা অ্যান্ড রিজিওনাল সার্ভার স্টেশনস ডাটাবেজ প্রকল্প:** জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যবস্থাপনায় এই প্রকল্পের অধীনে নির্বাচনী ডাটাবেজের জন্য সার্ভার স্টেশন তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয় যা শুরু হয় ২০০৮ সালের নভেম্বরে। এটি পিইআরপি প্রকল্পের সম্পূরক হিসেবে কাজ করে, যার অধীনে ভোটার রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবকাঠামো তৈরি করা হবে। ৪৭.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকল্পে ৪০৭টি উপজেলা, ৫৩টি জেলা এবং নয়টি আঞ্চলিক সার্ভার স্টেশন গঠন করা হবে। এই প্রকল্পের ব্যয়ভার বহন করছে যুক্তরাজ্য এবং নেদারল্যান্ড সরকার (তহবিলের প্রায় ৩০%) এবং বাংলাদেশ সরকার।
- **দ্য সাপোর্ট টু দ্য ইলেকটোরাল প্রসেস ইন বাংলাদেশ (এসইপিবি) প্রকল্প:** জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্প। ২০০৮ সালে ১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্পের অধীনে নির্বাচন কমিশন এবং এর সচিবালয়

[৮২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৪।

[৮৩] এই প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগীরা হচ্ছে ইউরোপীয় কমিশন, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, কোরিয়া, এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি।

[৮৪] কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), অস্ট্রেলিয়ান এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (অসএইড), সুইডেনের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট, এবং ডেনমার্ক, নরওয়ে ও নেদারল্যান্ডস দূতাবাস।

শক্তিশালীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এছাড়া সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ কার্যক্রমে তারা কারিগরি সহায়তা দেয় এবং জিআইএস-এর যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

- **ট্রান্সলুসেন্ট ব্যালট বাক্স প্রকল্প:** জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ২০০৮ সালের সংসদীয় নির্বাচনের পূর্বে এই প্রকল্পের অধীনে নির্বাচন কমিশনের জন্য দুই লাখ ৪০ হাজারটি ট্রান্সলুসেন্ট ব্যালট বাক্স ক্রয় করে। এই প্রকল্পের আনুমানিক বাজেট ছিল ৬.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা কানাডীয় সরকার একটি গ্রান্টের মাধ্যমে এই অর্থ বাংলাদেশ সরকারকে প্রদান করে।

তবে গবেষণায় দেখা যায় মাঠ পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ সময়মতো না যাওয়ার কারণে কমিশনের কর্মকর্তারা সমস্যায় পড়েন। অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের অর্থ দিয়ে নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করতে হয়।[৮৫] এছাড়া নির্বাচন কমিশনের কয়েকটি প্রকল্পে অর্থব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যার মধ্যে রয়েছে এসইএমবি প্রকল্পের অধীনে সুশাসনের জন্য নাগরিক – সুজনকে কুমিল্লা সিটি করপোরেশন ও শরিয়তপুর উপ-নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য প্রজেকশন মিটিং করার জন্য ৫০ লাখ টাকা দেওয়া, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজে নিয়োজিতদের জন্য চার কোটি টাকা মূল্যের ৭২ হাজার ব্যাগ ক্রয়ের আদেশ,[৮৬] এবং ঢাকায় সার্ভার স্টেশনের জন্য স্বাভাবিক দরের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দামে ফ্ল্যাট কেনা।[৮৭]

৪.৬ উপসংহার

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে কমিশনের সচিবালয়ের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এজন্য ‘নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধি, ২০০৯’ জারি করা হয়, যার মাধ্যমে কমিশনের সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের পার্থক্য দূর করার জন্য একটি একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনা প্রচলন করা হয়। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কমিশনের জনবল বাড়ানো হয়। তবে এখনো কমিশনে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা বিদ্যমান। নির্বাচন কমিশনের অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ, স্থানীয় পর্যায়ে সার্ভার স্টেশন নির্মাণ, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য, যদিও এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিশনের সমস্যা বিদ্যমান। সার্বিকভাবে বলা যায় নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আগের চেয়ে অনেক বেশি।

[৮৫] নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার অনুযায়ী।

[৮৬] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২। ব্যাগের মান খারাপ থাকার কারণে কার্যাদেশ বাতিল করা হয় ও এর জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

[৮৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ জুন ২০১২।

অধ্যায় পাঁচ

প্রধান স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা

নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচনী কার্যক্রম এককভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সরকার (জাতীয় সংসদ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ), রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী প্রত্যক্ষভাবে এবং গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের সংগঠন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার নির্বাচন কমিশনের কাজে পরোক্ষভাবে নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ অধ্যায়ে গবেষণার আওতাভুক্ত সময়ে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে প্রধান স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১ সরকার ও প্রশাসন

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশন দুই ধরনের সরকারের সময়ে এর কার্যক্রম পরিচালনা করেছে – প্রথম দুই বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং পরবর্তী সময়ে নির্বাচিত সরকার। নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে দুই সরকারের ভূমিকাই উল্লেখযোগ্য।

৫.১.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার

অষ্টম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণার পর ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। কিন্তু ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিতব্য নবম সংসদ নির্বাচনের জন্য সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচনে সকল দলের অংশগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণে দেশ একটি সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যায়। পরিণামে ২০০৮ সালের ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং দ্বিতীয় একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব উদ্যোগ নেয় তার মধ্যে দুর্নীতি ও কালোটাকার প্রভাব থেকে মুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও নির্বাচনের লক্ষ্যে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। রাজনৈতিক দলগুলোর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং এদের একটি জবাবদিহিতা কাঠামোর আওতায় আনার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন কমিশনের সুপারিশে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২) সংশোধন করে। আইন সংশোধন করে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, ঋণ ও বিল খেলাপিদের নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা, এবং নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা পুনরায় নির্ধারণ করা হয়। সব দলের জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরির জন্য এই সরকার নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহায়তা করে। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নির্বাচন-পূর্ব পরিবেশ ছিল পূর্ববর্তী নির্বাচনগুলোর তুলনায় শান্তিপূর্ণ।[৮৮] এর একটি কারণ হিসেবে জরুরি আইনের কারণে আরোপিত কিছু বিধি-নিষেধ, যেমন যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া র‍্যালি, মিছিল বা সভা-সমাবেশ করায় বিধি-নিষেধ চিহ্নিত করা যায়। সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের ১২ দিন আগে ২০০৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করে।

তবে কোনো কোনো সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এখতিয়ার-বহির্ভূত আচরণে নির্বাচন কমিশনের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন ২০০৮ এর ২০ সেপ্টেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঐ বছরের ১৮ ডিসেম্বর এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন দুটি ধাপে যথাক্রমে ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা দেন, যে ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার প্রধান নির্বাচন কমিশনারের। আখতারের (২০০৯) মতে এসময় নির্বাচন কমিশনের ওপর তৎকালীন সরকারের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ছিল।

৫.১.২ দলীয় নির্বাচিত সরকার

নবম সংসদ নির্বাচনের পর গঠিত দলীয় সরকারের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানান। সংসদ গঠনের পর প্রথম অধিবেশনেই নির্বাচন সংক্রান্ত সংশোধিত আইন সংসদে গৃহীত হয়, এবং 'নির্বাচন

---

[৮৮] উল্লেখ্য, যেখানে ২০০১ সালে ১ অক্টোবরের (অষ্টম সংসদ নির্বাচনের তারিখ) এক সপ্তাহ আগে নির্বাচনী সহিংসতায় ৩৮ জন নিহত ও কমপক্ষে ১,৬৭২ জন আহত হয়, এবং ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের (সপ্তম সংসদ নির্বাচনের তারিখ) আগের এক সপ্তাহে ৬ জন নিহত ও ১৬১ জন আহত হয়, সেখানে এবারে নির্বাচনের আগে কোনো সহিংস ঘটনা ঘটেনি (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮)।

কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯' প্রণয়নের মাধ্যমে সচিবালয়কে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে নির্বাচনের কমিশনের কার্যক্রমেও সরকার প্রভাব সৃষ্টি করেনি বলে সাবেক নির্বাচন কমিশনাররা জানান।[৮৯] প্রধান ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি সংলাপ আয়োজনে উদ্যোগী হন যেখানে সবগুলো রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।

তবে সরকার গঠনকারী প্রধান দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা উল্লেখ থাকলেও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করেনি। দলীয় সরকার অসহযোগিতা করার কারণে নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন করতে পারেনি। স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে প্রশাসনের প্রভাবকে একটি প্রধান সমস্যা বলে উল্লেখ করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা।[৯০] নির্বাচন কমিশনের অনুরোধ সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সরকারের পক্ষ থেকে সেনাবাহিনী মোতায়েন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন মেনে নেয়। সরকারের পক্ষ থেকে নিয়মিত অর্থ ছাড় না করার কারণে মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের আর্থিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয় বলে নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা যায়। নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে পূর্ববর্তী নির্বাচন কমিশনের মেয়াদ শেষে প্রদত্ত সুপারিশ সরকার আমলে নেয়নি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশন নির্বাচনগুলোতে প্রশাসনের সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সমন্বয়ের ঘাটতি ছিল বলে তথ্যদাতারা জানান।

৫.১.৩ বিচার বিভাগ

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে আদালতের কার্যক্রম নির্বাচন কমিশনের জন্য কখনো সহায়ক বা কখনো নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় নির্বাচনে কোনো কোনো মনোনয়ন-প্রত্যাশী প্রার্থীর প্রার্থিতা নির্বাচন কমিশন বাতিল করে দেওয়ার পর তারা আদালতে রিট করে এবং আদালত থেকে তাদের পক্ষে রায় দেওয়া হয়, যার সুযোগ নিয়ে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এতে কখনো কখনো নির্বাচন কমিশনকে শেষ মুহূর্তে প্রতীক বরাদ্দ, ব্যালট ছাপাসহ অন্যান্য বিষয় ঠিক করতে হয়েছে, যে কারণে সংশ্লিষ্ট আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠান ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। পরবর্তীতে আরও কয়েকটি নির্বাচনের অব্যবহিত আগে আদালতের রায় নির্বাচন কমিশনের কাজে প্রভাব ফেলে।[৯১]

নির্বাচনের পর নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের শ্লথগতি একটি উদ্বেগের বিষয়।[৯২] নবম জাতীয় নির্বাচনের পর ১৯টি নির্বাচনী মামলার মধ্যে মাত্র চারটির নিষ্পত্তি হয়েছে। নবম সংসদ নির্বাচনে তথ্য গোপন করে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন পাঁচজন সদস্য, যাঁরা সরকারের বিভিন্ন লাভজনক পদে থেকেই নির্বাচন করেন। এদের বিরুদ্ধে মামলার প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে তিনজনের সদস্যপদ বাতিল হয়েছে, যার দু'টি আসনে নতুন সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, এবং আরেকটি আসনে সদস্যপদ বাতিলের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে। বাকি মামলাগুলো এখনো চলমান। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের পর দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা প্রায় দুই হাজার, যার মধ্যে মাত্র দুইটির নিষ্পত্তি হয়েছে।[৯৩]

---

[৮৯] সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা বলেন, "গত সাড়ে চার বছরে নির্বাচন কমিশনের কাজে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করেনি বা কোনো চাপ দেয়নি।" সাবেক নির্বাচন কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন জানান, "২০০৯-এ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যখনই আমরা চেয়েছি সরকার সব ধরনের সহায়তা করেছে" (সূত্র: *দ্য ডেইলি স্টার*, ১৫ জুলাই ২০১১)।

[৯০] সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা বলেন,"রাজনৈতিক সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন কঠিন কাজ। নির্বাচন কমিশন কখনো প্রশাসনকে প্রভাবিত করে না, বরং রাজনৈতিক দলের নেতারাই স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করে থাকেন" (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ নভেম্বর ২০১১)। সাবেক নির্বাচন কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "রাজনৈতিক দল নয়, ইসির কাজে সমস্যা আমলাতন্ত্র" (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১০)।

[৯১] একটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন রিটার্নিং কর্মকর্তার ভাষায়, "এমনও দেখা গেছে, প্রতীক বরাদ্দ ও ব্যালট পেপার ছাপানো হয়ে গেছে, নির্বাচনের তারিখ একেবারে কাছাকাছি। একজন প্রার্থীর প্রার্থিতা যাচাই-বাছাই করে নির্বাচন কমিশন বাতিল করেছে। কিন্তু লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট তার প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করায় এই অল্প সময়ে সমস্ত ব্যালট পেপার পরিবর্তন করতে হয়েছে, যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এ কারণে হাইকোর্ট এ ধরনের যেন রায় না দিতে পারে তার জন্য নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে হাইকোর্টকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।"

[৯২] নির্বাচনী বিরোধ নিষ্পত্তির ইতিহাসে দেখা যায় ১৯৯১-১৯৯৫ সময়ের মধ্যে ৩১টি পিটিশনের মধ্যে ১৯টি মামলার সমাধান হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী ট্রাইবুনালের পরিবর্তে হাইকোর্টে নির্বাচনী বিবাদ মামলা গ্রহণের একটি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর হাইকোর্টে মোট ৩১টি মামলা দায়ের করা হয়, যার মধ্যে ১৮টি খারিজ হয়ে যায়। ফলে হাইকোর্টে বিশেষ ট্রাইবুনাল করার উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি।

[৯৩] *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ৭ সেপ্টেম্বর ২০১২।

৫.২ রাজনৈতিক দল

২০০৭ সালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপে বসার পরিকল্পনা করেন। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপের বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি। এটি অনুধাবন করে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয়তা আসার পর নির্বাচন কমিশন ২০০৭ এর ১২ সেপ্টেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শুরুর ঘোষণা দেয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রধানত নির্বাচনী সংস্কার ও রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন নিয়ে তিন দফা সংলাপ করে।[৯৪]

তবে অন্যতম প্রধান দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সাথে সংলাপে বসার ক্ষেত্রে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের দুটি করে ধারা (মূল দল ও সংস্কারপন্থী) তৈরি হয়। কিন্তু বিএনপি'র সংস্কারপন্থী ধারাটি খুবই স্পষ্টভাবে তাদের অবস্থান তুলে ধরে এবং নিজেদের বিএনপি'র মূলধারা হিসেবে দাবি করে, যেখানে বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির অনেক সদস্য ছিল বলে সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে বিএনপি'র কোন পক্ষকে নির্বাচনী সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হবে তা নিয়ে সমস্যায় পড়ে নির্বাচন কমিশন। বিএনপি'র মূলধারা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে একটি চিঠিতে অভিযোগ করে যে নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ে নির্বাচন কমিশন বিএনপি'র সাথে যোগাযোগ করছে না। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপি'র কোন অংশকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হবে তা বিএনপি'র গঠনতন্ত্র মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানান। গঠনতন্ত্র মূল্যায়ন করে নির্বাচন কমিশন ২০০৭ এর ২২ নভেম্বর সাইফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি'কে সংলাপে আহ্বান করে, প্রকৃতপক্ষে যা ছিল সংস্কারপন্থীদের অংশ।

নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি'র উভয় অংশের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করতে তাদের সংলাপে ডাকে, যেন তারা নির্বাচনী সংস্কার প্রস্তাবে মতামত দিতে পারে। বিএনপি'র দুটি অংশের বিরোধ মেটাতে ব্যর্থ হয়ে নির্বাচন কমিশন সাইফুর রহমান-নেতৃত্বাধীন বিএনপি'র অংশকে সংলাপে আহ্বান করে। সাইফুর রহমান-নেতৃত্বাধীন বিএনপি'র অংশ সংলাপে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু কারাবন্দী বিএনপি নেত্রীর অনুগত নেতারা সংলাপে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন তার পূর্বে নেওয়া সিদ্ধান্ত হতে পিছু হটে এবং বিএনপি'র মহাসচিবকে ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপি'র কাছে দুঃখ প্রকাশ করে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নির্বাচনী সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে, এবং ২০১১ এর জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন দলের সাথে সংলাপ আয়োজন করে, যার ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন কমিশন সরকারের কাছে সুপারিশ করার জন্য 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯'-এর আরও কিছু সংশোধন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইনের খসড়া, এবং নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত আইনের সংশোধনের খসড়া চূড়ান্ত করে। কিন্তু প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তৎকালীন কমিশনকে সরকারের অনুগত হিসেবে অভিযুক্ত করে এই উদ্যোগে ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। পরবর্তীতে এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে বর্তমান নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব গ্রহণের পর বিএনপি এই নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করে এবং এই কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না বলে ঘোষণা দেয়।[৯৫] বিএনপি ২০১২ সালের নাভেম্বর-ডিসেম্বরে নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের ওপর নির্বাচন কমিশন আয়োজিত সংলাপে অংশ নেয়নি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে উদ্ভূত বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্প্রতি বিএনপি'র পক্ষ থেকে বর্তমান নির্বাচন কমিশনারদের সরকারের আজ্ঞাবহ আখ্যা দিয়ে তাদের পদত্যাগ দাবি করা হয়।[৯৬] এছাড়া আরও কয়েকটি দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে কমিশন পুনর্গঠন এবং নির্বাচন কমিশনারদের পদত্যাগ দাবি করা হয়।

[৯৪] প্রথম দফা সংলাপ ২০০৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর, দ্বিতীয় দফা সংলাপ ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি এবং তৃতীয় দফা সংলাপ ২০০৮ এর সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দফা সংলাপে ইসলামী ঐক্য জোট, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, গণতন্ত্রী পার্টি ও আওয়ামী লীগ এবং ডিসেম্বরে এরশাদ-নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি অংশ নেয়। দ্বিতীয় দফা সংলাপে অংশ নেয় বিকল্প ধারা বাংলাদেশ, সাম্যবাদী দল, এবং ওয়ার্কার্স পার্টি অব বাংলাদেশ, গণতন্ত্রী পার্টি, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব) এবং জামায়াত-ই-ইসলামী। তৃতীয় দফা সংলাপে অংশ নেয় জাতীয় পার্টি (এরশাদ), ওয়ার্কার্স পার্টি অব বাংলাদেশ, গণতন্ত্রী পার্টি, এবং সাম্যবাদী দল।

[৯৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

[৯৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

৫.৩ গণমাধ্যম

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জারিকৃত জরুরি অবস্থার কারণে গণমাধ্যম রাজনীতির ওপর সংবাদ প্রকাশে বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়। ২০০৮ এর ১৭ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার পর গণমাধ্যম কোনো রকম বাধা ছাড়াই স্বাধীনভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রচারণার ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। নির্বাচন কমিশনে গণমাধ্যমের প্রবেশের ব্যাপারে যে ধরনের নিষেধাজ্ঞা ছিল তা এই কমিশন তুলে নেয়, এবং যেকোনো ধরনের তথ্যে গণমাধ্যমের প্রবেশ উন্মুক্ত করে দেয়। তবে এ সময় নির্বাচন কমিশন গণমাধ্যমের জন্য একটি আচরণ-বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ নিলেও তা সফল হয়নি।

৩০ বা তার বেশি প্রার্থী রয়েছে এমন দল বা জোটকে সমতার ভিত্তিতে সম্প্রচারের সময় (ইকুইটেবল এয়ারটাইম) দেওয়ার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন ও রেডিও স্টেশনগুলোকে একটি দিক-নির্দেশনা দেয় নির্বাচন কমিশন। এর মাধ্যমে প্রধান দু'টি দল তাদের প্রচারণার খবর প্রায় সমানভাবে সম্প্রচার করার সুযোগ পায়। নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস ট্রাস্ট এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে, যার মাধ্যমে ২০০৮ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশনের মেয়র পদপ্রার্থীদের নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এবং তা সম্প্রচার করা হয়। এরকম ১২টি বিতর্ক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। নির্বাচন কমিশন এ ধরনের অনুষ্ঠান জাতীয় নির্বাচনে করার উদ্যোগ নিলেও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অনিচ্ছায় তা সম্ভব হয়নি।

জাতীয় নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে গণমাধ্যমের ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়। নির্বাচনী আইন সংস্কার, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন, নির্বাচন কমিশনের কাঠামোগত পরিবর্তন ও শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণমাধ্যম পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিবেদন করে। নির্বাচন কমিশনও প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াকে তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করে। প্রধানত সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং দুইজন নির্বাচন কমিশনার দেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের নিয়মিত সাক্ষাৎকার দিতেন এবং তাদের কর্মকাণ্ডের হালনাগাদ তথ্য দিতেন। তবে গণমাধ্যমের জন্য সুনির্দিষ্ট মিডিয়া সেন্টার না থাকায় সাংবাদিকরা প্রতিদিনই যত্রতত্র কমিশনারদের উপস্থিত পেলেই তাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। অন্যদিকে কমিশনাররাও মিডিয়া ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিকদের সাথে তথ্যের আদান-প্রদান করতেন।

সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের অনেক সাংবাদিকের উপস্থিতি এবং তাদের লাগাতার উদ্যোগ ও কৌতুহল নির্বাচন কমিশন এবং তাদের প্রতিটি উদ্যোগকে অনেক বেশি জনপ্রিয় করেছে বলে সাবেক নির্বাচন কমিশনাররা স্বীকার করেন। নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সংক্রান্ত তথ্য প্রায় প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং সাধারণ মানুষের নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ে যা নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিল। অন্যদিকে অধিক সাংবাদিকদের যত্রতত্র উপস্থিতি এবং তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে ক্ষেত্রবিশেষে নির্বাচন কমিশনাররা বিড়ম্বনার শিকার হন – কোনো কোনো সময় তাঁদের কথার অপব্যাখ্যা বা ভুল ব্যাখ্যা করা হয়, তাঁদের কথার মর্মার্থ অনুধাবন না করে প্রতিবেদন ছাপা হয় বা বক্তব্যের মধ্য হতে দু'একটি শব্দ নিয়ে অতিরঞ্জিত প্রতিবেদন ছাপা হয়, কেবল পরিকল্পনায় রয়েছে বা আলোচনা হচ্ছে এমন বিষয়েও প্রতিবেদন ছাপা হয়, আবার একই বিষয়ে ভিন্ন খবরের কাগজে ভিন্ন ব্যাখ্যাসহ ছাপা হয়। এসবের পরও গণমাধ্যমের জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রবেশ উন্মুক্ত ছিল। তাই এই কমিশনের বিদায়ী অনুষ্ঠানেও সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার গণমাধ্যমের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করেন।

বর্তমান নির্বাচন কমিশন গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রাখার ক্ষেত্রে একই ধারা অব্যাহত রেখেছে। ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদ ও সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণের বিষয়ে ধারাবাহিক সংলাপের অংশ হিসেবে ২০১২ সালের ১০ অক্টোবর গণমাধ্যমের সাথে একটি সংলাপের আয়োজন করে, যেখানে দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

৫.৪ নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি সংস্থা

২০০৭ সালে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন তাদের কার্যক্রমে প্রয়োজন মনে করার প্রেক্ষিতে নাগরিক সমাজের পরামর্শ নিয়েছে। ফলে নাগরিক সমাজের সাথে সাবেক নির্বাচন কমিশনের একটি সু-সম্পর্ক ছিল। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে কয়েকজন মুখ্য তথ্যদাতার কাছ থেকে জানা যায়, নির্বাচন কমিশনে তাঁদের সহজ প্রবেশাধিকার ছিল। তাঁদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনা হয়েছে, তাঁদের সুপারিশের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২০০৭ সালে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনাররা নির্বাচন সম্পর্কিত মূল আইন (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২) সংস্কারের উদ্যোগ নেন। তাঁরা এই প্রক্রিয়ায় আইনের সংশোধন সংক্রান্ত সুপারিশ এবং গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করেন, এবং এর ওপর ভিত্তি করে আইনের একটি সংশোধিত খসড়া তৈরি করেন। ২০০৭ সালের মার্চে নির্বাচনী আইন সংস্কারের জন্য প্রণীত এই খসড়া প্রস্তাবনায় মতামত গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সংলাপ শুরু করে। মে মাসে জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক এবং সিনিয়র সাংবাদিকদের মতামত নিতে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় নির্বাচন এবং পরবর্তী সবগুলো উপ-নির্বাচন বা স্থানীয় নির্বাচনের পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন-পরবর্তী প্রতিবেদন নিয়ে যারাই নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনা করতে চেয়েছে, তারা তা পেরেছে। টিআইবি তার গবেষণার ফলাফল এবং সুপারিশ নিয়ে একাধিকবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার, অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশে টিআইবিকে গ্রহণ করে এবং টিআইবি'র সুপারিশ বাস্তবায়নে তাদের চ্যালেঞ্জ এবং বাস্তবায়নের সুযোগ নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়াও নির্বাচন কমিশন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে যার মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ এবং কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী বিতর্ক আয়োজন করা হয়।

৫.৫ উন্নয়ন সহযোগী

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সংস্কারের উদ্যোগের সাথে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে টেকনিক্যাল এবং আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সহযোগীর ভূমিকা পালন করে কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা। এসব উন্নয়ন সহযোগী নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনা করে এবং সুপারিশ দেয়, যার অনেকগুলো সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাস্তবায়ন করে। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) নির্বাচন সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য তহবিল প্রদান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক এনডিআই এবং আইআরআই নামক দু'টি সংস্থাকে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপের আয়োজন করে এনডিআই, আর দু'টি এক্সিট পোলসহ একটি জনমত জরিপ করে আইআরআই। তবে কোনো কোনো সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক ওঠে।

৫.৬ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে নির্বাচনী কার্যক্রম এককভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সরকার (তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচিত সরকার), রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী প্রত্যক্ষভাবে এবং গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের সংগঠন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার নির্বাচন কমিশনের কাজে পরোক্ষভাবে নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে একদিকে যেমন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন, প্রশাসনিক সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা দেওয়া হয়, অন্যদিকে সুপারিশ আমলে না নেওয়া, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন না করা, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রশাসনিক প্রভাব ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের শ্লথগতি একটি উদ্বেগের বিষয়। নির্বাচন কমিশনকে এ সময়ে একটি অন্যতম প্রধান দলের আস্থা অর্জনে বেগ পেতে হয় বলে দেখা যায়। গণমাধ্যমের ভূমিকা নির্বাচন কমিশনের জন্য খুবই সহায়ক ছিল বলে দেখা যায়, এবং নির্বাচন কমিশনও গণমাধ্যমের কাছে উন্মুক্ত ছিল। একইভাবে নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, নির্বাচনী আইন সংস্কার, ও সার্বিকভাবে নির্বাচনী সংস্কৃতি পরিবর্তনে নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

অধ্যায় ছয়

নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং কার্যক্রমের গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে এর সার্বিক কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করা যায় (আকরাম ও দাস, ২০০৬)। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে নির্বাচন কমিশনের সততাকে চিহ্নিত করা হয়েছে (হুদা, ২০১৩)। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে (২০০৭ থেকে ২০১৩ এর আগস্ট পর্যন্ত) সম্পন্ন কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে দেখা যায় নির্বাচন কমিশনের বেশ কিছু অগ্রগতি রয়েছে, তবে একইসাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়।

৬.১ নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি

নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও নির্বাচন সংক্রান্ত - এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

৬.১.১ প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি

- **স্বাধীনতা:** নির্বাচন কমিশন সচিবালয়কে কমিশনের অধীন নিয়ে আসা এবং আর্থিক স্বাধীনতা কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। ২০০৭ সালের পর থেকে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, এবং সরকারের দিক থেকে সব ধরনের আর্থিক সহায়তা বিদ্যমান ছিল বলে মুখ্য তথ্যদাতার জানান।
- **জনবল ব্যবস্থাপনা সংস্কার:** একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনবল ব্যবস্থাপনার সংস্কার আরেকটি অগ্রগতি। কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধি সংশোধনের ফলে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আরও বেশি সমন্বয় সাধিত হয়েছে।
- **সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি:** নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায় সর্বোচ্চ সংখ্যক নির্বাচন গ্রহণযোগ্যভাবে আয়োজন, নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিজস্ব ও দক্ষ জনবল ব্যবহার ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে। সাবেক নির্বাচন কমিশন পাঁচ বছর পর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনের জন্য একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করে। এই পরিকল্পনায় পাঁচটি লক্ষ্য চিহ্নিত করা হয়, যেখানে নির্বাচনী গণতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদান প্রতিফলিত। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।[৯৭]
- **তথ্য প্রকাশের ধারার সূচনা:** কমিশনের কার্যক্রমের ফলে তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের ধারা সূচিত করে যার মধ্যে রয়েছে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য, নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য এবং নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত তথ্য এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, এবং ওয়েবসাইটের বাংলা সংস্করণ প্রচলন করা।
- **বিভিন্ন সংস্কার প্রক্রিয়ায় সব স্টেকহোল্ডারকে সম্পৃক্ত করা:** কমিশনের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার প্রক্রিয়ায় সব স্টেকহোল্ডারকে কার্যকরভাবে যুক্ত করা হয়।

৬.১.২ নির্বাচন সংক্রান্ত

- **নির্বাচনী আইন ও প্রক্রিয়া সংস্কার, এবং বাস্তবায়ন:** নির্বাচন কমিশন শুধু নির্বাচন আয়োজনই নয়, বরং এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে, যার মধ্যে রয়েছে নির্বাচনী আইন ও প্রক্রিয়া সংস্কার ও এসব আইন বাস্তবায়ন করা।
- **ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সীমানা পুনর্নির্ধারণ:** ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি ও হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া সংস্কারের ফলে একটি নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা প্রবর্তিত হয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অন্যতম পূর্বশর্ত। নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ আরেকটি অগ্রগতি যা পূর্ববর্তী কমিশনগুলো করতে পারেনি।

---

[৯৭] কৌশলগত লক্ষ্যগুলো হচ্ছে (১) নির্বাচন কমিশনের প্রতি একটি শক্তিশালী আস্থার জায়গা তৈরি করা এবং একে স্বাধীন করা, (২) নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকার নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখা, (৩) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করা, (৪) দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পেশাগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এবং (৫) গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে সমর্থন করা। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, *পঞ্চবার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা* ২০১১ - ২০১৬, ঢাকা, এপ্রিল ২০১১।

- **রাজনৈতিক দলের তদারকি কাঠামো প্রবর্তন:** রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যার মাধ্যমে প্রথমবারের মত একটি তদারকি কাঠামো প্রবর্তিত হয়েছে। নির্বাচনে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য জমা, রাজনৈতিক দলগুলোর বার্ষিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা (আয়-ব্যয়) সংক্রান্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।
- **নির্বাচনী সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন:** বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে একটি গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রধান সবগুলো রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হয় এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনী প্রচারণায় শৃঙ্খলা এসেছে, যার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রধান রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সাধারণভাবে আচরণ বিধি মেনে চলা এবং নির্বাচনী ফলাফল মেনে নেওয়ার মাধ্যমে। ভোটার তালিকা প্রণয়ন থেকে শুরু করে সীমানা পুনর্নির্ধারণ, নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধি সংস্কার, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দিক থেকে ব্যাপক সমালোচনা ছিল না, বরং নির্বাচনের ফলাফল গ্রহণ করে নেওয়া এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিবেদনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশংসা এর কার্যক্রমে সার্বিকভাবে নিরপেক্ষতার স্বাক্ষর বহন করে।[৯৮]

৬.২ নির্বাচন কমিশনের চ্যালেঞ্জ

- **জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করা:** সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রেক্ষিতে নির্বাচনের সময় নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার ২০১১ সালের ৩০ জুন সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করেছে। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী সংসদ বহাল রেখে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। যদি সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো কারণে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয় তবে সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই সময়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সরকারই নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন।[৯৯] সংসদ বহাল রেখে নির্বাচন হলে মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের তুলনায় অন্য প্রার্থীদের জন্য সমমানের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিত করা সম্ভব কিনা এই বিতর্কের মধ্যে কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার সাম্প্রতিক উদ্যোগ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সংসদ বহাল রেখে নির্বাচনকালীন সরকার কর্তৃক অনুকূল নির্বাচনী পরিবেশে নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিশেষজ্ঞদের অনেকে সংশয় প্রকাশ করছেন (মজুমদার, ২০১৩, ২০১২; হোসেন, ২০১২; মজুমদার, ২০১২; নজরুল, ২০১২)। কমিশনের পর্যাপ্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি সত্ত্বেও নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীলতা অব্যাহত রয়েছে; দশম সংসদ নির্বাচনেও জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[১০০] আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনে সাম্প্রতিক বিতর্কিত রদবদল[১০১] ও পদোন্নতির কারণে নির্বাচন পরিচালনায় প্রশাসনের ওপর দলীয় প্রভাবের আশংকা রয়েছে (মজুমদার, ২০১২)। এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, নির্বাচনী প্রচারণায় কালোটাকা ও পেশীশক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রণ এবং আচরণ বিধি লঙ্ঘন রোধে কমিশনের ভূমিকাও সবার জন্য সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ (হোসেন, ২০১২; মজুমদার, ২০১২)।
- **প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা বৃদ্ধি:** নির্বাচন কমিশন কিছু বিতর্কিত কার্যক্রম ও উদ্যোগের কারণে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে অনাস্থা প্রকাশিত হয়। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে বিএনপি'র সাথে নেতৃত্ব নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি[১০২], বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টকে (বিএনএফ) নিবন্ধন দেওয়ার প্রক্রিয়া[১০৩], নির্বাচনী প্রচারণায় মন্ত্রী-সংসদ সদস্যদের বিশেষ সুবিধা

---

[৯৮] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই), ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই), এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস ফাউন্ডেশন, ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ, রূপান্তর, এশিয়া ফাউন্ডেশন, অধিকারসহ অন্যান্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানের নবম জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন। এছাড়া বিভিন্ন উপ-নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, সিটি করপোরেশন নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পর বিভিন্ন নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যেখানে বেশিরভাগ নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

[৯৯] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১২৩(৩) ও ১২৩(৩)(খ)।

[১০০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ জানুয়ারি ২০১৩।

[১০১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ জানুয়ারি ও ১৫ জুন ২০১৩। উল্লেখ্য, নতুন নিয়োগ পাওয়া জেলা প্রশাসকেরা সরকারদলীয় সমর্থক হিসেবে পরিচিত।

[১০২] নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কারের সময়ে আয়োজিত সংলাপে বিএনপি'র মূলধারা ও সংস্কারপন্থীদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অবস্থান ও তা নিয়ে বিতর্ক (আখতার ২০০৯)। এক্ষেত্রে ভুল স্বীকার করা সত্ত্বেও এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিএনপি এর পর থেকেই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে আসছে।

[১০৩] উল্লেখ্য, নিবন্ধনের জন্য আবেদন আহবানের প্রেক্ষিতে যে ৪১টি দল আবেদন করে তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে বিএনএফ বিবেচিত হয়। বিএনএফ প্রতীক হিসেবে ধানের শীষ, গমের শীষ বা রজনীগন্ধার জন্য আবেদন করে, যা বিএনপি'র প্রতীক ধানের শীষের কাছাকাছি। তবে

দেওয়ার উদ্যোগ, নির্বাচন কমিশনের প্রার্থিতা বাতিল সংক্রান্ত ধারা (৯১-ই) বাতিলের সুপারিশ, আচরণ বিধি লঙ্ঘনের শাস্তি কমানোর সুপারিশ, একটি উপ-নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে কমপক্ষে তিন বছর থাকার বাধ্যবাধকতার ধারা স্থগিত রাখা[১০৪], সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সরকারী দল সমর্থিত প্রার্থীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ, দশম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদি। এসব নানাবিধ কারণে কমিশনের ওপর রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা বাড়ানো একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এছাড়া সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ, নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন ও ইভিএম ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক প্রধান বিরোধী দলের আস্থা অর্জনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বর্তমান নির্বাচন কমিশন দশম সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে, এবং বিএনপি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়।

- **স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রভাব:** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা আরও শক্তিশালী হয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ করা কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এসব নির্বাচন আয়োজনে কমিশন সরকারের ওপর নির্ভরশীল। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থছাড় ও জনবল প্রাপ্তি, এবং নির্বাচন কমিশনে নিয়োগের ক্ষেত্রে এখনো সরকারের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করতে হয় (হুদা, ২০১৩)। নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনকে প্রশাসনসহ সরকারের অন্যান্য বিভাগের ওপর নির্ভর করতে হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সেনাবাহিনী নিয়োজিত করার সিদ্ধান্তে সরকারের অসহযোগিতা, এবং ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন আয়োজনে সরকারের অনাগ্রহ নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলে।
- **আইনি সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণ:** বিভিন্ন আইনি সংস্কারের জন্য সরকারের ওপর নির্ভর করতে হয় নির্বাচন কমিশনকে। ফলে বিভিন্ন আইনি সীমাবদ্ধতা, যেমন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সুনির্দিষ্ট আইন না থাকা, নির্বাচনের সময় সুনির্দিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা না থাকা, নির্বাচনী প্রচারণার আওতা ও শুরুর সময় নির্ধারিত না থাকা, নির্বাচনী ব্যয় নিরীক্ষা করার পদ্ধতি প্রচলন না থাকা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইনি সংস্কার কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- **আইন প্রয়োগে দৃঢ়তা প্রদর্শন:** নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং নির্ধারিত সীমার বাইরে নির্বাচনী ব্যয় রোধ করা কমিশনের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি প্রয়োগে নির্বাচন কমিশনের সীমাবদ্ধতার কারণে নির্ধারিত সীমার বাইরে নির্বাচনী ব্যয় ও আচরণবিধি লঙ্ঘন রোধ করা যায়নি। বর্তমান নির্বাচন কমিশন জনসংখ্যাভিত্তিক সীমানা নির্ধারণ না করেই ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়, যার প্রেক্ষিতে আইনি নোটিশ জারি করা হয় এবং হাইকোর্টের রায়ে নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। এই নির্বাচন উপলক্ষে যথাসময়ে ব্যাটারি আমদানি নিয়ে অনিশ্চয়তার কারণে ইভিএম ব্যবহার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।
- **প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা:** প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা কমিশনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি প্রক্রিয়ায় কিছু অস্বচ্ছতা ও বিতর্ক ছিল, যার প্রমাণ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা। এর বাইরে নির্বাচন কমিশনের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। জনবল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করায় ব্যর্থতার কারণে কমিশনের পেশাগত দক্ষতা ও আন্তরিকতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দশম জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বর্তমান কমিশন আসন-ভিত্তিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, নির্বাচনী আইনের সংস্কার ইত্যাদি কার্যক্রম সময়মতো সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছে।

সর্বোপরি, জনগণের আস্থা অর্জন করা নির্বাচন কমিশনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।

৬.৩ উপসংহার

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে দেখা যায় স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা, কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণ - সবগুলো ক্ষেত্রেই নির্বাচন কমিশনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। আলোচ্য সময়ে নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক ও আর্থিক উভয় ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা বেড়েছে, নিরপেক্ষভাবে ও কার্যকরভাবে কমিশনের দায়িত্ব (ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, নির্বাচন পরিচালনা ইত্যাদি) সম্পন্ন করেছে, তথ্যের উন্মুক্ততার মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করেছে এবং এর কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে। কিন্তু অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়েছে, যার কোনোটি ছিল অভ্যন্তরীণ ও কোনোটি ছিল বাহ্যিক।

প্রতীকের তালিকায় গমের শীষ না থাকলেও এটি যোগ করার কথা ভাবছে বলে জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ আগস্ট ২০১৩)।

[১০৪] গাজীপুর-৪ আসনের উপ-নির্বাচনে প্রার্থীর রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে কমপক্ষে তিন বছর থাকার বাধ্যবাধকতার ধারা স্থগিত রাখা হয়, যার সুবিধা নিয়ে একজন প্রার্থী হন এবং নির্বাচিত হন (সূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ১১ নভেম্বর ২০১২)।

অধ্যায় সাত

উপসংহার

৭.১ গবেষণার প্রধান পর্যবেক্ষণ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় ২০০৭ সালে পুনর্গঠিত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন কমিশন বেশ কিছু আইনি সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে যার মধ্যে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতার শর্ত বৃদ্ধি, প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, জাতীয় নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী কেন্দ্র পরিবর্তন ও প্রার্থিতা বতিলের ক্ষমতা, একজন প্রার্থীর সর্বোচ্চ তিনটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ, নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা পুনর্নির্ধারণ, আচরণ বিধির মাধ্যমে প্রার্থীদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কঠোরতা বৃদ্ধি, 'না' ভোটের সুযোগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা ও নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়োগ বিধি জারি করা হয়, যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়। তবে এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন না করা, নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের অযোগ্যতাজনিত সদস্যপদ বাতিলের ক্ষমতা না থাকা, প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, তফসিল ঘোষণার আগে নির্বাচনী প্রচারণা আচরণ বিধির অন্তর্ভুক্ত না করা এবং নির্বাচনে সমান ক্ষেত্র তৈরি না হওয়া ইত্যাদি আইনি সীমাবদ্ধতা এখনো বিদ্যমান।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় কমিশন এ সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন আয়োজন করে। এসব নির্বাচন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সব মহলের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। নির্বাচন কমিশন প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল না থেকে পর্যায়ক্রমে নিজস্ব জনবল দিয়ে এসব নির্বাচন আয়োজন করে। তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে সরকার ও প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করতে হয়। কমিশনের উদ্যোগে নির্বাচনী আচরণ বিধিতে গুণগত কিছু পরিবর্তন আনার পরও জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা বিভিন্নভাবে আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছে বলে দেখা যায়। তবে কমিশনের পক্ষ থেকে আচরণ বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা ছিল।

নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নবম জাতীয় নির্বাচনের জন্য ছবিসহ নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন, যা পরবর্তীতে বর্তমান কমিশনের দ্বারা হালনাগাদ করা হয়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ২০০৮ সালে সংসদীয় এলাকার সীমানা নতুন করে নির্ধারণ, যা বর্তমান কমিশন ২০১৩ সালে আবার সম্পন্ন করেছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ এবং নির্বাচনের পর প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী প্রকাশ নির্বাচন কমিশনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। তবে রাজনৈতিক দলের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের তথ্য নির্বাচন কমিশনে নিয়মিত জমা হলেও এ সংক্রান্ত তথ্য কমিশন প্রকাশ করেনি।

নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পর্যালোচনা করে দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়ে কমিশনের সচিবালয়ের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এজন্য 'নির্বাচন কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধি, ২০০৯' জারি করা হয়, যার মাধ্যমে কমিশনের সচিবালয় ও মাঠ পর্যায়ের পার্থক্য দূর করার জন্য একটি একীভূত কর্মী ব্যবস্থাপনা প্রচলন করা হয়। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কমিশনের জনবল বাড়ানো হয়। তবে এখনো কমিশনে নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা বিদ্যমান। নির্বাচন কমিশনের অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যার মধ্যে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ, স্থানীয় পর্যায়ে সার্ভার স্টেশন নির্মাণ, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও নির্বাচন কমিশনের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য, যদিও এখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমিশনের সমস্যা বিদ্যমান।

সার্বিকভাবে বলা যায় নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে গৃহীত নির্বাচনী ও প্রাতিষ্ঠানিক আইনের সংস্কারের ফলে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এসব সংস্কারের ফলে নির্বাচনী সংস্কৃতির একটি গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, যেখানে প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি জবাবদিহি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে যার তদারকির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের হাতে ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কমিশনের অধীনে নিয়ে আসার ফলে

এটি প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও শক্তিশালী হয়েছে। এছাড়া প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে নির্বাচন কমিশনের কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় বেড়েছে, এবং শক্তিশালী নেতৃত্বের কারণে কমিশনের গ্রহণযোগ্যতা সার্বিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

গবেষণার অন্তর্ভুক্ত সময়ে সরকার (তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচিত সরকার), রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী প্রত্যক্ষভাবে এবং গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের সংগঠন ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার নির্বাচন কমিশনের কাজে পরোক্ষভাবে নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে একদিকে যেমন আইন প্রণয়ন ও সংশোধন, প্রশাসনিক সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা দেওয়া হয়, অন্যদিকে সুপারিশ আমলে না নেওয়া, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন না করা, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে প্রশাসনিক প্রভাব ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে। নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের শ্লথগতি একটি উদ্বেগের বিষয়। নির্বাচন কমিশনকে এ সময়ে একটি অন্যতম প্রধান দলের আস্থা অর্জনে বেগ পেতে হয় বলে দেখা যায়। গণমাধ্যমের ভূমিকা নির্বাচন কমিশনের জন্য খুবই সহায়ক ছিল বলে দেখা যায়, এবং নির্বাচন কমিশনও গণমাধ্যমের কাছে উন্মুক্ত ছিল। একইভাবে নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, নির্বাচনী আইন সংস্কার, ও সার্বিকভাবে নির্বাচনী সংস্কৃতি পরিবর্তনে নাগরিক সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমকে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখলে বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ - এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। নির্বাচন কমিশন নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলো (সব রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জন, নির্বাচনী প্রস্তুতি, বিদ্যমান আইন প্রয়োগে দৃঢ়তার প্রমাণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা) মোকাবেলা করতে পারলেও বাহ্যিক চ্যালেঞ্জগুলোর (যেমন নির্বাচনের সময় সরকার কাঠামো, নির্বাচনের সময় নির্ধারণ, আইনি সংস্কারে সরকারের ওপর নির্ভরশীলতা, প্রশাসনিক প্রভাব) ওপর কমিশনের নিয়ন্ত্রণ নেই। সার্বিকভাবে বলা যায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষে এককভাবে তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

৭.২ সুপারিশ

গবেষণার পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হল।

ক. নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

১. **সকল অংশীজনের আস্থা অর্জন:** রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সকলের, বিশেষকরে ভোটারদের আস্থা অর্জন করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমে নিম্নে উল্লিখিত উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে হবে।
   - নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা খর্ব হয় এমন কোনো বিতর্কিত উদ্যোগ না নেওয়া, বরং শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করা;
   - দলীয় প্রভাবমুক্ত হয়ে নির্বাচনী আইন ও বিধির প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
   - নির্বাচন ও কমিশন সম্পর্কিত সংস্কার উদ্যোগে সকল রাজনৈতিক দলসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা;
   - নির্বাচনী আচরণ বিধি সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাচনে সবার জন্য সমান ক্ষেত্র তৈরিতে কমিশনের ভূমিকা নিশ্চিত করা।

২. **নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার:** জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনায় কমিশনের নিজস্ব জনবল ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রশিক্ষণসহ যোগ্যতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রাধান্য দিতে হবে।

৩. **নির্বাচনকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করা:** ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন, ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরা, ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচনকে আরও বেশি প্রযুক্তিনির্ভর করতে হবে।

৪. **নির্বাচন কমিশনের নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা:** নির্বাচন কমিশনের যেসব কার্যক্রম নিয়মিতভাবে করার কথা, যেমন ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা, নির্বাচনী আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা ইত্যাদি আইন অনুসরণ করে প্রভাবমুক্ত হয়ে পেশাদারিত্বের সাথে অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কমিশন প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা ও কর্ম-পরিকল্পনা বিবেচনায় নিয়ে, বিশেষকরে তার সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে বর্তমান কমিশনের কৌশলপত্র ও কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে। একটি পঞ্চবার্ষিকী নির্বাচনী ক্যালেন্ডার তৈরি করে তা অনুসরণ করতে হবে।

৫. **তথ্য প্রকাশ:** নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে অধিকতর স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রকাশিত তথ্যের পাশাপাশি যেসব তথ্য নির্বাচন কমিশনকে প্রকাশ করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দলের বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, পুনর্নির্ধারিত নির্বাচনী আসনের ভোটারসংখ্যাসহ তালিকা, নির্বাচনী মামলা সংক্রান্ত তথ্য, নির্বাচন কমিশনের আয়োজিত সকল অংশীজনের সাথে সংলাপের ফলাফল বা প্রতিবেদন, স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সার্বিক তথ্য, নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন, এবং নির্বাচন কমিশনের বিস্তারিত বাজেট, বার্ষিক নিরীক্ষাকৃত আর্থিক বিবরণীসহ সকল দলিল।

খ. সরকারের ভূমিকা

৬. **প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন:** প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা ও বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক অঙ্গীকার অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে হবে। এই আইনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের যোগ্যতা, তাদের নিয়োগের প্রক্রিয়া, সংখ্যা, অপসারণের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধান থাকতে হবে। এই প্রক্রিয়া হতে হবে দলনিরপেক্ষ, স্বচ্ছ এবং সবগুলো রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

৭. **আইনি সংস্কার:** নির্বাচনী আইনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা দূর করতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে:

- নির্বাচনকালীন সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্বরাষ্ট্র, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পদায়ন ও বদলির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা;
- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী তিনমাস পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে (যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে) কমিশনের অধীনে রাখা;
- প্রার্থিতা বাতিল, সংসদ সদস্যপদ বাতিল, ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- স্থানীয় কমিটির মনোনয়নকৃত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলক করা;
- সংশোধিত সংবিধানের আলোকে নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা;
- প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন যাচাই-বাছাই অন্তর্ভুক্ত করা;
- রাজনৈতিক দলের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ সংক্রান্ত ধারা অন্তর্ভুক্ত করা;
- আচরণ বিধি লঙ্ঘন সংক্রান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আইনে সব ধরনের অসামঞ্জস্যতা দূর করা;
- নির্বাচনী ট্রাইবুনালের অধীনে অভিযোগ দায়ের করার পরবর্তী ছয়মাসের মধ্যে আপিলসহ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
- রাজনৈতিক দল ও জাতীয় নির্বাচনে নারী, সংখ্যালঘু ও প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য প্রযোজ্য আইন সংশোধনের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা;
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'না' ভোটের পুনঃ প্রচলন করা।

গ. রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

৮. **সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রকাশ:** প্রতি বছর সংসদ সদস্যদের আর্থিক তথ্য নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে, যা নির্বাচন কমিশন জনগণের জন্য প্রকাশ করবে।

৯. **রাজনৈতিক দলের আর্থিক তথ্য প্রকাশ:** প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং দলের আয়, ব্যয় এবং সম্পদের হালনাগাদকৃত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

১০. **সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চর্চা:** রাজনৈতিক দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্রের চর্চা বাড়াতে হবে। তৃণমূল থেকে মনোনীত এবং সৎ, জনগণ-সম্পৃক্ত, জনকল্যাণে নিয়োজিত, অসাম্প্রদায়িক, রাজনীতির অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ব্যক্তিকে জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। এক্ষেত্রে নারী, সংখ্যালঘু ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিতদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। দুর্নীতিপরায়ণ, কালো টাকার মালিক ও সন্ত্রাসীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।

১১. **নির্দলীয় স্থানীয় সরকার নির্বাচন:** স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনকে দলীয় প্রভাবের বাইরে রাখতে হবে।

ঘ. নাগরিক সংগঠনের ভূমিকা

১২. **নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ:** নাগরিক সংগঠন কর্তৃক প্রথাগত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কমিশনের কার্যক্রম, নির্বাচনী অর্থায়ন এবং ব্যয় আইনানুগ ও স্বচ্ছ হচ্ছে কি না তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

ঙ. গণমাধ্যমের ভূমিকা

১৩. **নির্বাচনী তথ্য প্রকাশ:** গণমাধ্যমকে নির্বাচনে প্রার্থীদের ব্যক্তিগত ও আর্থিক তথ্য, নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন, নির্বাচনী ব্যয় ইত্যাদি সংক্রান্ত গভীর অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

****

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

আকরাম, শম, দাস, সক ও মাহমুদ, ত ২০১২, 'রাজনৈতিক অর্থায়নে স্বচ্ছতা: চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', শাহজাদা আকরাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় (তৃতীয় খণ্ড)*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

আকরাম, শম ও দাস, সক ২০১০, *নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরীক্ষা: প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার ওপর একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

আখতার, মই ২০০৯, *অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন*, এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, এপ্রিল ২০১১, *দ্বি-বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ২০১১ - ২০১৩*, ঢাকা।

নজরুল, আ, ২০১২, 'রায়ে সমাধান নেই, আছে সংকট', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ সেপ্টেম্বর।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, 'বর্তমান সরকারের বিগত তিন বছরের অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে অর্জন বিষয়ক প্রতিবেদন', ২৭ জুন ২০১২।

মজুমদার, আই, ২০১২, 'দশম সংসদ নির্বাচন ও নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৩ অক্টোবর।

মজুমদার, আই, ২০১২, 'কাপাসিয়া জাতীয় নির্বাচনের মডেল হতে পারে না', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ অক্টোবর।

মজুমদার, আই, ২০১২, 'জনপ্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে পারবে কি?', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ সেপ্টেম্বর।

মজুমদার, বআ, ২০০৯, *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মজুমদার, বআ (সম্পাদিত), ২০০৮, *সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন*, সুজন- সুশাসনের জন্য নাগরিক, ঢাকা।

মজুমদার, বআ, ২০১২, 'নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাব নিয়ে সংশয়', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ নভেম্বর।

মজুমদার, বআ, ২০১২, 'উপনির্বাচন থেকে জাতীয় নির্বাচনের শিক্ষা', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ অক্টোবর।

রহমান, মম ১৯৮৮, *বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন,* প্রেস প্রকাশনা ও জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রুমানা, শ, আফরোজ, ফ, দাস, সক ও আকরাম, শম ২০১২, *সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা।

হোসেন, মসহ, ২০১২ 'সংসদ রেখে সংসদ বিতর্ক', *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০ আগস্ট।

হোসেন, মসহ, ২০১২ 'টাঙ্গাইল-৩ উপনির্বাচন: মার্কা যেখানে গুরুত্ব পায়নি', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৯ নভেম্বর।

Akram, SM & Das, SK 2006, 'Bangladesh Election Commission', Transparency International Bangladesh, Dhaka.

Akram, SM, Das, SK & Mahmud, T 2010, *Political Financing in Bangladesh*, Transparency International Bangladesh, Dhaka.

Bangladesh Election Commission 2011, *Five-Year Strategic Plan 2011-2016*, Dhaka.

Eicher, P, Alam, Z & Eckstein, J 2010, *Elections in Bangladesh 2006-2009: Transforming Failure into Success*, UNDP, Dhaka.

Election Working Group 2013, 'Observation of the Election Commission Bangladesh (ECB) Voter Registration Process, Phase 4: October - December 2012', Dhaka.

Huda, ATMS 2013, 'Its meaning, attributes and limit: Independence of Bangladesh Election Commission', *The Daily Star*, 17 March.

Hussain, MS 2012, *Electoral Reform in Bangladesh 1972 - 2008*, Palok Publications, Dhaka.

Khan, AA 2013, 'Electoral Challenges in Bangladesh: The choice between the unpalatable and disastrous', *The Daily Star*, 17 March.

Majumdar, BA, 2013, 'Which way towards free, fair and meaningful elections?', *The Daily Star*, 17 March.

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

Asian Network for Free Elections (Anfrel) Foundation 2008, 'Preliminary Report: Bangladesh Election Observation Mission 2008'.

Election Working Group 2008, 'Bangladesh Ninth Parliamentary Election: Election Observation Report'.

International Republican Institute and USAID 2008, 'Exit Poll: Bangladesh Parliamentary Election'.

JANIPOP 2010, 'Election Observation Report on 117 Electoral Constituency Bhola-3'.

JANIPOP 2010, 'Election Observation Report on Chittagong City Corporation Elections'.

National Democratic Institute (NDI) 2008, Statement of The NDI Election Observer Delegation to Bangladesh's 2008 Parliamentary Elections.

Rupantar 2009, 'Report on 9th Parliament Election Observation'.

The Asia Foundation, Odhikar, International Foundation for Electoral Systems 2009, 'Election Violence Education and Resolution'.

WAVE Foundation 2009, 'Election Observation Report on Bangladesh Ninth Parliamentary Election'.

পরিশিষ্ট ১

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন: কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি (ফেব্রুয়ারি ২০০৭ - আগস্ট ২০১২)

তারিখ	ঘটনা
২০০৭	
৪/২/২০০৭	ড. এটিএম শামসুল হুদা প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং মুহাম্মদ ছহুল হোসেন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত
১০/২/২০০৭	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব আব্দুর রশিদ সরকারকে বদলি
১৩/২/২০০৭	নির্বাচন কমিশনার হিসেবে ব্রিগেডিয়ার (অব.) সাখাওয়াত হোসেন নিয়োগপ্রাপ্ত
৪/৩/২০০৭	বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বিএমএসপি)-এর নির্বাচন কমিশনকে সহায়তার জন্য একটি ইলেকশন কেয়ারটেকিং কাউন্সিল (জিসিসি) গঠনের প্রস্তাব
২০/৩/২০০৭	সাবেক বিতর্কিত নির্বাচন কমিশনার এসএম জাকারিয়া কোন ধরনের অনিয়মের সাথে জড়িত ছিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত
৫/৪/২০০৭	তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের আহ্বান
৬/৪/২০০৭	পরবর্তী ১৮ মাসে কোনো জাতীয় বা স্থানীয় সরকারের নির্বাচন না করার ঘোষণা প্রধান নির্বাচন কমিশনারের
৬/৪/২০০৭	নির্বাচনী সংস্কারের ওপর একগুচ্ছ সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশ নির্বাচন কমিশনের
৯/৪/২০০৭	পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের আগে একইসাথে ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয় পত্র তৈরির সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য একটি পাইলট প্রজেক্ট করার সিদ্ধান্ত
১৬/৪/২০০৭	২০০৮ সালের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার ঘোষণা
১৭/৪/২০০৭	স্থগিতকৃত নবম সংসদীয় নির্বাচনের আগে হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা ছাপানোর কাজ প্রদানে অনিয়মের সন্ধান লাভ নির্বাচন কমিশনের একটি তদন্ত কমিটির
২৬/৪/২০০৭	নির্বাচনী আইন সংস্কারের জন্য প্রণীত একটি খসড়া প্রস্তাবনায় মতামত গ্রহণের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সংলাপ শুরু
২৮/৪/২০০৭	নির্বাচন কমিশনকে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হতে পৃথক করতে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ গ্রহণ
৩০/৪/২০০৭	রাজনৈতিক দল-সম্পৃক্ত ছাত্র সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছু প্রস্তাব
১৫/৫/২০০৭	আগস্ট মাসের মধ্যে আংশিকভাবে ছবিসহ ভোটার তালিকা এবং জাতীয় পরিচয় পত্র প্রণয়নের জন্য ক্যাম্প তৈরির সিদ্ধান্ত
২০/৫/২০০৭	সংসদীয় নির্বাচনে প্রার্থীদের ওপর আস্থার অভাব প্রকাশের জন্য 'না' ভোট চালুর প্রস্তাব
৮/৬/২০০৭	পরবর্তী সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে ৫৩৬ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাব অর্থ উপদেষ্টা মির্জা আজিজুল ইসলাম-এর
১১/৬/২০০৭	ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয় পত্র প্রস্তুতির মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা জানতে নির্বাচন কমিশনের পাইলট প্রকল্প শুরু গাজীপুরের শ্রীপুর পৌরসভায়
১২/৬/২০০৭	রাজনৈতিক দল বা তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় বিদেশী দাতাদের তহবিল গ্রহণের ওপর নির্বাচন কমিশনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ
২৪/৬/২০০৭	উপদেষ্টাদের কাউন্সিল নির্বাচন কমিশনের জন্য একটি স্বাধীন সচিবালয় গঠনের প্রস্তাবনা নীতিগতভাবে অনুমোদন
২৫/৬/২০০৭	অনিবাসী এবং ছিটমহলবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিবন্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ
৪/৭/২০০৭	নাম-সর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে সংলাপ করবে না বলে সিদ্ধান্ত
১৫/৭/২০০৭	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক একটি পরিপূর্ণ রোডম্যাপ ঘোষণা
২২/৭/২০০৭	উপদেষ্টাদের কাউন্সিল ভোটার তালিকা (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৭ নীতিগতভাবে অনুমোদন, যার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সম্পর্কিত বিধিমালা প্রণয়নে আরও ক্ষমতায়িত
২৪/৭/২০০৭	ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয় পত্র প্রস্তুতির কাজটি বাড়ি-হতে-বাড়ি যেয়ে করা হবে বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
১/৮/২০০৭	বিদ্যমান ভোটার তালিকা সংশোধন না করেই ছবিসহ নতুন একটি ভোটার তালিকা তৈরির প্রাথমিক কাজ রাজশাহী সিটি করপোরেশন থেকে শুরু
২/৮/২০০৭	আইনি বিতর্ক থেকে দূরে থাকার জন্য সরকারকে বিদ্যমান ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ বাতিল এবং ছবিসহ নতুন ভোটার তালিকা তৈরির জন্য আইন প্রণয়ন করার সুপারিশ
৫/৮/২০০৭	সরকারের ২২টি ক্ষেত্রে চাকরি বা অন্যান্য সুবিধা পেতে বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় পরিচয় পত্রের ব্যবহারের জন্য একটি আইন প্রণয়ন করার সুপারিশ
১২/৮/২০০৭	রাজশাহী সিটি করপোরেশন হতে ছবিসহ ভোটার তালিকা ও জাতীয় পরিচয় পত্র প্রণয়নের মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু
১৫/৮/২০০৭	নতুন ভোটার তালিকা দিয়ে জানুয়ারি মাসে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে প্রথম নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত
১৬/৮/২০০৭	ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ উপকরণের দরদাতারা অযোগ্য হওয়ার প্রেক্ষিতে আবার দরপত্র আহ্বান; এর ফলে পুরো ক্রয় প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হবে কিনা তা নিয়ে সংশয়
২১/৮২০০৭	৩০ আগস্টের মধ্যে অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা না তুললে সরকারকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আবারও আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত
২৯/৮/২০০৭	অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে নিশ্চয়তা আসার পর ১২ সেপ্টেম্বর থেকে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শুরুর ঘোষণা

তারিখ	ঘটনা
১২/৯/২০০৭	নির্বাচনী সংস্কারের খসড়া প্রস্তাবনা চূড়ান্তকরণে ইসলামী ঐক্য জোটের সাথে সংলাপের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ শুরু
২১/৯/২০০৭	রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনার জন্য নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে তহবিল প্রদানের একটি সীমা নির্ধারণ করার প্রস্তাব দান
২৩/৯/২০০৭	জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য বছরের শেষ দিকে চলমান জরুরি অবস্থা শিথিল করার ঘোষণা
২৫/৯/২০০৭	নির্বাচন সম্পর্কিত বিষয়ে নির্বাচন কমিশন বিএনপি'র সাথে যোগাযোগ করছে না বলে চিঠির মাধ্যমে অভিযোগ প্রকাশ
৩/১০/২০০৭	ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজটি ত্বরান্বিত করতে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিটি জেলা সদরে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি করার সুযোগ দিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আহ্বান
১১/১০/২০০৭	দলীয় রাজনীতির ছত্রছায়া থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে মুক্ত করতে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের দলীয় পদ ছাড়ার প্রস্তাব
১৯/১০/২০০৭	চলমান নির্বাচনী সংস্কারের ওপর সংলাপে বিএনপি'র নতুন মহাসচিবকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত, যদিও আব্দুল মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বাধীন সংস্কারপন্থীদের মূলধারার বিএনপি হিসেবে দাবি
২১/১০/২০০৭	এরশাদ-নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিকে সংলাপে আমন্ত্রণ ও রওশন এরশাদের দাবি বাতিল
২১/১০/২০০৭	বিএনপি'র কোন অংশকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানাবে তা বিএনপি'র গঠনতন্ত্র মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘোষণা
২৩/১০/২০০৭	নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে রাজনৈতিক দলের নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে সরে আসা, যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে রাখে না
৩১/১০/২০০৭	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল উত্থাপিত ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রস্তাবের প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নীতিগত সমর্থন
৫/১১/২০০৭	নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর 'কেন আইনগতভাবে বৈধ বিএনপি নেতাদের সংলাপে আহ্বান জানানো হবে না' বিষয়ের ওপর দুই সপ্তাহের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য হাইকোর্টের রুল জারি
৬/১১/২০০৭	২২ নভেম্বর সাইফুর রহমান-নেতৃত্বাধীন বিএনপিকে নির্বাচনী সংস্কারের ওপর সংলাপে আহ্বান; এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সাইফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন অংশকে মূল বিএনপি হিসেবে স্বীকৃতি দান
২০/১১/২০০৭	সাইফুর-নেতৃত্বাধীন বিএনপি'র কাছে প্রেরিত চিঠির আইনগত বৈধতা নিয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সাইফুর-নেতৃত্বাধীন বিএনপি'র সাথে সংলাপ বাতিলের আদেশ হাইকোর্ট-এর
২৯/১১/২০০৭	জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের জন্য সামরিক বাহিনীর সহায়তায় পোলিং স্টেশন নির্ধারণের কাজ শুরু
১৪/১২/২০০৭	ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে মোট ৩০০ কোটি টাকার সহায়তার তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর - ভোটার তালিকা প্রণয়ন, স্থানীয় সরকার সংস্কার এবং গ্রাম আদালত চালু করার জন্য
১৮/১২/২০০৭	নির্বাচন সম্পর্কিত কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে নিজস্ব একটি আইনজীবী প্যানেল তৈরি করার পরিকল্পনা
২০/১২/২০০৭	২০০৮ সালের মার্চ মাসে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, এবং সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা
২০০৮	
৮/১/২০০৮	সংসদীয় আসনে ভোটারদের সংখ্যায় ভারসাম্য আনতে নির্বাচনী এলাকা পুনঃসীমানাকরণ করার ঘোষণা
১৪/১/২০০৮	জেলাভিত্তিক সংসদীয় এলাকার নতুন তালিকা প্রকাশ; ১৮টি জেলায় সংসদীয় আসন কমে বা বাড়ে
১৪/১/২০০৮	কিশোরগঞ্জ হতে যোগ্য ভোটারদের জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদান শুরু
২৭/১/২০০৮	হাইকোর্টের নির্বাচন কমিশনকে চার সপ্তাহের মধ্যে 'কেন পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করা হবে না' বিষয়ে কারণ দর্শানোর রুল জারি; এছাড়াও 'কেন ৯০ দিনের মধ্যে কেন নির্বাচন আয়োজন করতে পারল না' তা সম্পর্কেও নির্বাচন কমিশনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দান
৪/২/২০০৮	প্রধান উপদেষ্টাকে এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য কয়েকটি সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভায় নির্বাচন আয়োজনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে জরুরি অবস্থা তুলে নিতে বা শিথিল করতে আহ্বান
৪/২/২০০৮	১২ ফেব্রুয়ারির পর রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে দ্বিতীয় দফায় সংলাপ করার পরিকল্পনা
৫/২/২০০৮	দেশব্যাপী অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ওপর হতে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে মার্চের শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়া যাতে রাজনৈতিক দল তাদের কর্মকাণ্ড শুরু করতে পারে এবং নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধিত হতে পারে
১৩/২/২০০৮	সংসদীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেটে ৫৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আহ্বান
১৭/২/২০০৮	২০২০ সালের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সব স্তরের কমিটিগুলোতে কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী থাকবেন বলে লক্ষ্য নির্ধারণ
২০/২/২০০৮	অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের কাছে থেকে আসা দাবির প্রেক্ষিতে যুদ্ধাপরাধীদের সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ হতে বিরত করতে নির্বাচনী আইনে বিধান অন্তর্ভুক্ত
২৪/২/২০০৮	১৫টি রাজনৈতিক দলের সাথে দ্বিতীয় দফা সংলাপ শুরু; নেতৃত্বজনিত বিতর্কের জন্য বিএনপিকে সংলাপে না ডাকার সিদ্ধান্ত
২৬/২/২০০৮	বিনামূল্যে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স পেতে কানাডার সরকারের সাথে আলোচনা শুরু
১৬/৪/২০০৮	আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি'র উভয় অংশের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য দূর করতে সংলাপে আহবান, যেন তারা নির্বাচনী সংস্কার প্রস্তাবে মতামত দিতে পারে
২২/৪/২০০৮	বিএনপি'র দুটি অংশের বিরোধ মেটাতে ব্যর্থ হয়ে সাইফুর রহমান-নেতৃত্বাধীন অংশকে সংলাপে আহ্বান

তারিখ	ঘটনা
২৭/৪/২০০৮	সাইফুর রহমান-নেতৃত্বাধীন বিএনপি'র সংলাপে অংশগ্রহণ, কিন্তু কারাবন্দী খালেদা জিয়ার অনুগত নেতারা সংলাপে অংশগ্রহণ হতে বিরত
২৯/৪/২০০৮	সীমানা পুনঃচিহ্নিতকরণের পর জেলাভিত্তিক সংসদীয় আসনের একটি খসড়া তালিকা প্রকাশ
১২/৫/২০০৮	সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে 'কেন সংসদীয় আসনের সীমানা পুনঃচিহ্নিতকরণ এর উদ্যোগটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হবে না' বিষয়ে কারণ দর্শানোর জন্য হাইকোর্টের রুল
১৩/৫/২০০৮	নির্বাচনী সংস্কারের প্রস্তাবনাগুলোকে আইনে পরিণত করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে পাঠানো
২৬/৫/২০০৮	প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে একটি সভায় সংসদীয় নির্বাচনের সাথে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন আয়োজন করার বিরোধিতা বিভাগীয় কমিশনারদের
২০/৬/২০০৮	আগস্ট মাসের ৪ তারিখ চারটি সিটি করপোরেশন এবং নয়টি পৌরসভা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা
১৩/৭/২০০৮	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন এবং নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন যথাক্রমে অক্টোবরে এবং ডিসেম্বরে অনুষ্ঠানের জন্য মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বদলির জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আহ্বান
১৫/৭/২০০৮	চারটি সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদপ্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী বিতর্ক সরকার-নিয়ন্ত্রিত টেলিভিশন এবং রেডিও চ্যানেলে সম্প্রচারের উদ্যোগ - সিলেটের প্রার্থীদের নিয়ে প্রথম অনুষ্ঠান
১৭/৭/২০০৮	সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভা নির্বাচনে সামরিক বাহিনীকে মাঠে না নামানোর সিদ্ধান্ত
২৩/৭/২০০৮	বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে ১.৬ লক্ষ আটকে পড়া পাকিস্তানীদের নতুন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত
৪/৮/২০০৮	চারটি সিটি করপোরেশন এবং নয়টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত
৬/৮/২০০৮	উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০০৮' অনুমোদন
২৮/৮/২০০৮	বিএনপি'র মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনকে ৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ
৩১/৮/২০০৮	নির্বাচনী সংস্কারের প্রস্তাবনায় রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণের ইস্যুতে বিএনপি'র সাথে নির্বাচন কমিশনের পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বিএনপি'র কাছে দুঃখ প্রকাশ
৫/৯/২০০৮	রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তৃতীয় দফা সংলাপ শুরু
৮/৯/২০০৮	আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিকে সংলাপে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ
২০/৯/২০০৮	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বছরের ১৮ ডিসেম্বর এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন দুটি ধাপে যথাক্রমে ২৪ ও ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা
১৯/১০/২০০৮	সীমানা পুনঃচিহ্নিতকরণের ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ তুলে নিতে পুনরায় পিটিশন
২৫/১০/২০০৮	সর্বশেষ তিনটি সংসদীয় নির্বাচনের বিজয়ী ও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর একটি তালিকা বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানোর মাধ্যমে ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সংসদীয় নির্বাচনে ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ হতে বিরত রাখার উদ্যোগ
২/১১/২০০৮	নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বছরের ১৮ ডিসেম্বর এবং উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণা
৪/১১/২০০৮	ঋণখেলাপি চিহ্নিত করতে সংসদ নির্বাচনের প্রায় ৯,০০০ জন সম্ভাব্য প্রার্থীর একটি তালিকা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক এবং সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠানো
৮/১১/২০০৮	২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা চূড়ান্ত; এই নির্বাচনের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং নারী ভাইস-চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ
১০/১১/২০০/	২০ নভেম্বরের মধ্যে যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধন করবে তারাই শুধুমাত্র নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে বলে ঘোষণা
১২/১১/২০০৮	সংসদীয় নির্বাচনের আগে নির্বাচন সম্পর্কিত অনিয়ম প্রতিরোধে বিচার-বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে ৮০টি নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি গঠন
১৫/১১/২০০৮	সরকারের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভার মেয়ররা সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে সিদ্ধান্ত
২০/১১/২০০৮	সংসদীয় এবং উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাই এবং প্রত্যাহারের সময়সীমা পুনঃনির্ধারণ
২১/১১/২০০৮	সংসদীয় নির্বাচনের সময়সূচি পুনঃনির্ধারণের ব্যাপারে একটি ঐকমত্যে পৌছাতে বিএনপি-নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের সাথে আলোচনা
২১/১১/২০০৮	৩৭টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলকে নবম সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য হিসেবে ঘোষণা
২২/১১/২০০৮	সংসদীয় নির্বাচনের সময়সূচি পুনঃনির্ধারণের ব্যাপারে একটি ঐকমত্যে পৌছাতে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা
২৩/১১/২০০৮	২০০৮ এর ২৯ ডিসেম্বর সংসদীয় নির্বাচন এবং ২০০৯ এর ২২ জানুয়ারি উপজেলা নির্বাচনের তারিখ পুনঃনির্ধারণ
২৫/১১/২০০৮	৩৯টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল এবং তাদের মনোনীত ব্যক্তিরা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধিমালা যেন মেনে চলে সে সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর সিদ্ধান্ত
৪/১১/২০০৮	আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত
৪/১২/২০০৮	প্রধান একটি রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ হতে ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এলায়েন্স (ফেমা)-কে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত
১১/১২/২০০৮	রিটার্নিং অফিসারদের বিভিন্ন কারণে মোট ৫৫৭ জন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বাতিল; তাদের মধ্যে ৩০০ জনের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচন কমিশনে আপিলের প্রেক্ষিতে শুনানি এবং ১১৯ জনের প্রার্থিতা ফেরত

তারিখ	ঘটনা
১৮/১২/২০০৮	সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশের মাধ্যমে মনোনয়নপত্র বাতিলকৃত ২১ জন প্রার্থীর প্রার্থিতা ফিরে পাওয়া
২১/১২/২০০৮	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে শাস্তিযোগ্য নির্বাচনী অপরাধের বিচারের ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল সুপ্রিম কোর্টের; এ স্থলে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটদের
২৯/১২/২০০৮	দেশব্যাপি ৩০০টি আসনে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত
২০০৯	
৪/১/২০০৯	নির্বাচন কমিশনের সাথে নিবন্ধনের বিষয়টি দলের গঠনতন্ত্রে আনতে জাতীয় সম্মেলন করার জন্য আওয়ামী লীগের নির্বাচন কমিশনের কাছে আরও ছয়মাস সময় চাওয়ার সিদ্ধান্ত
২২/১/২০০৯	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত
১২/২/২০০৯	রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত
২৮/৫/২০০৯	১৫ জুন হতে ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কাজ শুরু করার ঘোষণা
১৬/৬/২০০৯	২৫ জুলাইয়ের মধ্যে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্থায়ী গঠনতন্ত্র নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত
২১/৭/২০০৯	বিদেশে অস্থায়ীভাবে বসবাসরত বাংলাদেশীদের ভোটার করার জন্য ভোটার তালিকা আইন সংশোধন করার আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত
২/৮/২০০৯	আর্থিক প্রতিবেদন জমাদানের বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়ার জন্য বিএনপি'র নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ
৫/৮/২০০৯	সর্বশেষ নির্বাচনের সময় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে যেসব দুর্বলতা পাওয়া যায় তা সংশোধনের জন্য নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে সংলাপ করার সিদ্ধান্ত
২৯/৯/২০০৯	রাজধানী ও অন্যান্য পাঁচটি মেট্রোপলিটন এলাকায় ছবিসহ ভোটার তালিকা হালনাগাদের কাজ শুরু
২/১১/২০০৯	রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের সংশোধিত গঠনতন্ত্র নির্বাচন কমিশনে জমাদানের সময়সীমা আরও ছয়মাস বাড়িয়ে 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) বিল ২০০৯ অনুমোদন
২০১০	
১৪/৪/২০১০	আসন্ন ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সীমিত আকারে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ শুরুর জন্য বিধিমালা প্রণয়ন
২৪/৪/২০১০	ভোলা-৩ আসনের উপ-নির্বাচন সম্পন্ন
৪/৫/২০১০	চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনের আগে মেয়র পদপ্রার্থীদের নিয়ে দু' তিনটি প্রজেকশন মিটিং করার পরিকল্পনা
১৮/৫/২০১০	১৭ জুন তারিখে অনুষ্ঠিতব্য চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অবাধ ব্যালট যুদ্ধ নিশ্চিত করতে এবং নির্বাচনী প্রচারণায় অনিয়ম তুলে আনতে ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করার পরিকল্পনা, ও সীমিত আকারে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত
১৬/৬/২০১০	চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত
১৬/৭/২০১০	আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন খান আলমগীর-এর সদস্যপদ বাতিল করায় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের বৈধতা দেয় হাইকোর্ট, যা সুপ্রিম কোর্টও সমর্থন করে
২৩/৯/২০১০	সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ওপর ভিত্তি করে চাঁদপুর ১ সংসদীয় আসন শূন্য ঘোষণা
২/১১/২০১০	রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয়ে স্বচ্ছতা আনতে রাষ্ট্র কর্তৃক তহবিল প্রদানের বিষয়ে একটি আইনের খসড়া তৈরি
২১/১২/২০১০	হাইকোর্টের রায়ে মুলতবিকৃত ছয়টি পৌরসভার নতুন সময়সূচি (জানুয়ারি ২৭) ঘোষণা
২৩/১২/২০১০	মধ্য-জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য পৌরসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক পরিচিতি ছাড়া রাজনৈতিক দল সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে কোনো সমস্যা নেই বলে সিদ্ধান্ত
২০১১	
২/১/২০১১	আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভয়-ভীতি প্রদর্শনের ঘটনায় ঝিনাইদহ এবং রামগড় পৌরসভার নির্বাচনী তফসিল বাতিল
১০/১/২০১১	২৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য হবিগঞ্জ ১ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩ উপনির্বাচনে সেনাবাহিনী নিয়োজিত করা হবে বলে ঘোষণা
১২/১/২০১১	দেশব্যাপি মোট ২৪৩টি পৌরসভা নির্বাচনের মধ্যে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ৭২টি পৌরসভায় নির্বাচন শুরু
১৩/১/২০১১	খুলনা ও বরিশাল বিভাগের পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত
১৫/১/২০১১	কোনো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত পুনর্ব্যক্ত
১৮/১/২০১১	চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগের পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত
২৭/১/২০১১	হবিগঞ্জ ১ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৩ উপনির্বাচন এবং পাঁচটি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত
২৪/২/২০১১	ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে দলীয় রাজনীতি এবং প্রভাবের বাইরে রাখতে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ করতে চাইলেও কোনো রাজনৈতিক দলেরই এ সংলাপে না আসা
২৯/৩/২০১১	চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বরিশাল বিভাগের ১২টি উপকূলীয় জেলার ২৪টি উপজেলাধীন ১৯০টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত
৭/৪/২০১১	নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালত কোনো রায় প্রদানের পূর্বে নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনা করা বাধ্যতামূলক করার জন্য সংসদীয় বিশেষ কমিটিতে প্রস্তাব পাঠানো
১৯/৪/২০১১	দেশব্যাপী ৩৮০০টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ৩১ মে হতে ৫ জুলাইয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা
৫/৫/২০১১	২৬টি জেলার ৪৮জন বেসরকারি স্কুল এবং কলেজের শিক্ষককে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে নির্বাচন কমিশনকে হাইকোর্টের নির্দেশ

তারিখ	ঘটনা
২৫/৫/২০১১	জাতীয় নির্বাচনে কালোটাকার প্রভাব বন্ধ করতে নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলোকে রাষ্ট্র কর্তৃক তহবিল প্রদানের জন্য 'ইলেকটোরাল ক্যাম্পেইন এক্সপেনডিচার (পাবলিক ফান্ড) অ্যাক্ট, ২০১১' এর খসড়া তৈরি
২৭/৫/২০১১	নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের অসদাচারণ এবং অযোগ্যতার জন্য শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা চেয়ে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে পরিবর্তন আনার প্রস্তাবের খসড়া তৈরি
১৩/৬/২০১১	আসন্ন সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য বিএনপিকে আবারও আমন্ত্রণ জানাতে চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত
১৪/৬/২০১১	নির্বাচনী সংস্কারের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শুরু
২১/৬/২০১১	প্রধান বিরোধী দল বিএনপি'র "বিতর্কিত" হিসেবে বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপে বসতে অনীহা প্রকাশ
২১/৬/২০১১	নারায়নগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে পরীক্ষামূলকভাবে ইভিএম ব্যবহারের পরিকল্পনা
৫/৬/২০১১	নির্বাচনী সংস্কারের ওপর চলমান সংলাপে বসার জন্য তৃতীয়বারের মত বিএনপিকে চিঠি
১৩/৭/২০১১	ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে সরকারের ঢিলেঢালা মনোভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের হতাশা প্রকাশ
২৪/৭/২০১১	ইভিএম-এর প্রতি জনগণের আস্থা অর্জনে আগামী সংসদীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত
২৯/৭/২০১১	সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার পেছনে অপর্যাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতি কারণ হিসেবে উল্লেখ নির্বাচন কমিশনের
৭/৮/২০১১	আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনায় বসলেও সংস্কার প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করা হতে বিরত
১৩/৮/২০১১	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ১৮ নং ওয়ার্ডে ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণের পাইলট প্রকল্প ২০১১ এর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন
২২/৯/২০১১	নবগঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা
৫/১০/২০১১	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ঠিকাদার বা ঋণখেলাপি চিহ্নিত করে ২৭ জন কমিশনার পদপ্রার্থীর আবেদন বাতিল
৫/১০/২০১১	বিএনপি'র বিরোধিতা সত্ত্বেও নারায়নগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত
১১/১০/২০১১	হাইকোর্টের আদেশ অমান্য করে পিরোজপুর পৌরসভার মেয়র প্রার্থীকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নির্বাচিত করায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য পাঁচ জনের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট আদালত অবমাননার রুল জারি
৩০/১০/২০১১	নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত; নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার এবং সেনাবাহিনী নিয়োজিত না করার অভিযোগে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী তৈমুর খন্দকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত
২/১১/২০১১	কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বৃহৎ আকারে ইভিএম ব্যবহারের পরিকল্পনা
২২/১১/২০১১	কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা; সকল কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার এবং সেনাবাহিনী নিয়োজিত না করার ঘোষণা
৪/১২/২০১১	দু'ভাগে বিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন ৯০ দিনে করা সম্ভব না বলে নির্বাচন কমিশনের মন্তব্য
২২/১২/২০১১	নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে রাষ্ট্রপতির সংলাপ শুরু
২০১২	
৫/১/২০১২	কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত; সম্পূর্ণ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার; মাত্র পাঁচ ঘন্টায় ফলাফল প্রকাশ; পরাজিত প্রার্থীর ফলাফল গ্রহণ
১২/১/২০১২	নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ নিয়ে ২৩টি রাজনৈতিক দলের সাথে রাষ্ট্রপতির সংলাপ শেষ
১৫/১/২০১১	নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে রাষ্ট্রপতির অনুসন্ধান কমিটি গঠনের প্রস্তাব; আইন বা প্রজ্ঞাপন জারি করে কার্যকর করার সুপারিশ; রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব অনুযায়ী অনুসন্ধান কমিটি হবে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট - এর প্রধান হবেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতি, সদস্যরা হচ্ছেন হাইকোর্টের একজন বিচারপতি, বাংলাদেশ কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান
২১/১/২০১২	নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে অনুসন্ধান কমিটি গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি
২৫/১/২০১২	অনুসন্ধান কমিটির প্রথম সভায় নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে নাম চাওয়ার সিদ্ধান্ত; পরবর্তীতে বিএনপি ও জাতীয় পার্টিসহ ১৭টি দলের পক্ষ থেকে কোনো নাম না দেওয়া
৮/২/২০১২	প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে সাবেক সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ, এবং নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আবু হাফিজ, অবসরপ্রাপ্ত যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ আবদুল মোবারক, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. জাভেদ আলী ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. শাহনেওয়াজকে নিয়োগ দান
১৬/২/২০১২	নতুন নির্বাচন কমিশনের প্রথম বৈঠকে চার ধাপে ভোটার তালিকা হালনাগাদের সিদ্ধান্ত
২৭/২/২০১২	১৫ মার্চ শরিয়তপুর ৩ আসনের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের কারণে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নাহিম রাজ্জাক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত
১/৩/২০১২	দেশব্যাপি ভোটার তালিকা হালনাগাদ শুরু
৯/৪/২০১২	ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা; ২৪ মে ভোট গ্রহণ
১৬/৪/২০১২	নির্বাচনী আসন পুনর্বিন্যাস না করার কারণে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচন হাইকোর্টের আদেশে তিন মাস স্থগিত
২৩/৭/২০১২	ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচন স্থগিতাদেশ আরও তিন মাস বৃদ্ধি
৮/৮/২০১২	বিএনপি'র আপত্তির কারণে দশম জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার না করার ঘোষণা; বিএনপি'র পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ

তারিখ	ঘটনা
৩০/০৯/২০১২	গাজীপুর-৪ আসনের উপ-নির্বাচন সম্পন্ন
২৬/১১/২০১২	নির্বাচনী সীমানা পুনর্নির্ধারণ সম্পর্কে মতামত গ্রহণের জন্য নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শুরু
২৮/১১/২০১২	টাঙ্গাইল-৩ আসনের উপ-নির্বাচন সম্পন্ন
৪/১২/২০১২	রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ শেষ; বিএনপিসহ কয়েকটি দলের সংলাপ বর্জন
১৫/১২/২০১২	ভোটার তালিকা হাল-নাগাদের কাজ শেষ। নতুন ভোটার ৬৯ লাখ ৩০ হাজার ৩০৩ জন।
২০/১২/২০১২	রংপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ
২০১৩	
১৭/১/২০১২	চট্টগ্রাম-১২ আসনের উপ-নির্বাচন সম্পন্ন
৩১/১/২০১৩	হালানাগদকৃত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ; মোট ভোটার ৯,২১,২৯,৮৫২ জন (পুরুষ ৪,৬২,০১,৮৭১; নারী ৪,৫৯,২৭,৯৮১)
৭/২/২০১৩	জাতীয় সংসদের ৮৪টি আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস করে খসড়া গেজেট প্রকাশ; ২৩ এপ্রিল থেকে ১২ মে পর্যন্ত শুনানি সম্পন্ন
১৩/৫/২০১৩	ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচন সংক্রান্ত রিট খারিজ এবং নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার
১৫/৬/২০১৩	খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচন সম্পন্ন
৩/৭/২০১৩	কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের উপ-নির্বাচন সম্পন্ন
৬/৭/২০১৩	গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন সম্পন্ন
২৫/৭/২০১৩	কমিশনের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আইন সংশোধনের প্রস্তাব
৩১/৭/২০১৩	প্রধান দলগুলোসহ ২৭টি দলের বার্ষিক আর্থিক হিসাব জমা; বাকি দশটি দলের সময় বাড়ানোর আবেদন
২৯/৮/২০১৩	চূড়ান্তভাবে ৫৩টি আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ; আসনভিত্তিক ভোটার তালিকা চূড়ান্ত

পরিশিষ্ট ২

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ পদ্ধতি) আইন, ২০১২ (প্রস্তাবিত)

যেহেতু প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম। এই আইন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ পদ্ধতি) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, আইন

(ক) "অনুসন্ধান কমিটি" অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত অনুসন্ধান কমিটি;

(খ) "কমিশন" অর্থ সংবিধানের অনুচ্ছদ ১১৮ এর দফা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(গ) "কার্য উপদেষ্টা কমিটি" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির বিধি ১৯ অনুসারে গঠিত কমিটি;

(ঘ) "ধারা" অর্থ এই আইনের কোনো ধারা;

(ঙ) "নির্বাচন কমিশনার" অর্থ সংবিধানের অনুচেছদ ১১৮ এর দফা (১) এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনার বা ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাচন কমিশনার;

(চ) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৩। কমিশন গঠন। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর দফা (১) এর অধীন কমিশন, একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও একজন মহিলা নির্বাচন কমিশনারসহ অনধিক পাঁচ জন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

৪। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ। দক্ষ, সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করিবেন।

৫। অনুসন্ধান কমিটি। (১) বিদ্যমান নির্বাচন কমিশনের মেয়াদান্তে কমিশন পুনর্গঠন কিংবা কমিশনের শূণ্য কোনো পদ পূরণের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি থাকিবে, যথা:

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার, যিনি কমিটির আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারক;

(গ) সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান;

(ঘ) মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক; এবং

(ঙ) দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান।

তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান কমিটির জ্যেষ্ঠ সদস্য আহবায়কের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) ধারা ৪ এর অধীন যোগ্যতাসম্পন্ন এবং গুণাবলী সংবলিত ব্যক্তিদের প্যানেল তৈরিজনিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য অনুসন্ধান কমিটি উহার কার্য পরিচালনার নিয়মাবলী তৈরি করিবে।

(৩) অনুসন্ধান কমিটি ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিন জনের নাম সংবলিত একটি প্যানেল প্রস্তুতপূর্বক সুপারিশ তৈরি করিবে এবং উক্তরূপ সুপারিশ, তৈরিকৃত প্যানেলসহ, জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির পরীক্ষা ও বিবেচনার জন্য, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৪) উপদেষ্টা কমিটি উপধারা (৩) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্যানেল পরীক্ষান্তে চূড়ান্ত করিয়া এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে করিবেন;

৬। প্যানেলে কতিপয় ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি নিষিদ্ধ। আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন প্রণীতব্য প্যানেলে এমন কোনো ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যদি

(ক) তিনি সাধারণভাবে সৎ বলিয়া বিবেচিত না হন এবং বৈধ আয়ের ভিত্তিতে জীবন নির্বাহ না করিয়া থাকেন;

(খ) তিনি জাতীয় বা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হন বা অনুরূপ দলের বা অনুরূপ দলের অঙ্গসংগঠনের সদস্য হন;

(গ) তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন;

(ঘ) তাঁহার প্রার্থিতা বিবেচনার তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে তৎকর্তৃক সাধারণ ঋণগ্রহীতা, কোম্পানির পরিচালক বা অংশীদার হিসাবে গৃহীত ঋণ বা ঋণের কোনো কিস্তি অপরিশোধিত থাকে।

৭। সাচিবিক দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অনুসন্ধান কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

....

রাষ্ট্রপতি

পরিশিষ্ট ৩

নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০১২ (প্রস্তাবিত)

যেহেতু সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন রহিত করিয়া একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। আইনের প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর থাকিবে।

৩। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) "আসন" অর্থ জাতীয় সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোনো এলাকা;

(খ) "ইউনিয়ন" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২(৫) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন;

(গ) "উপজেলা" অর্থ স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর অধীন দফা (ঘ) এ বর্ণিত উপজেলা;

(ঘ) "কমিশন" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(ঙ) "জনসংখ্যা" কোটা অর্থ সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী সমগ্র দেশের জন্য প্রাপ্ত জনসংখ্যাকে সংসদের সমুদয় আসন দ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে সেই সংখ্যা;

(চ) "জেলা" অর্থ The Districts Act, 1836 (Act No.XXI of 1836) এর বিধান অনুসারে সরকার কর্তৃক সৃষ্ট জেলা;

(ছ) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(জ) "সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট" অর্থ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন-এর ক্ষেত্রে ওয়ার্ড; এবং

(ঝ) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ২(১৪)-তে সংজ্ঞায়িত সিটি কর্পোরেশন।

৪। কমিশনকে সহায়তা প্রদান।- কমিশন এই আইনের অধীন উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের যে কোনো ব্যক্তি বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে নির্দেশিত হইলে উক্ত ব্যক্তি বা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ উক্ত দায়িত্ব পালন বা উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫। সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজের পরিধি।- (১) কমিশন, সংসদের আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, দেশকে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর দফা (২) এর অধীন নির্বাচিতব্য সদস্য সংখ্যার সমান সংখ্যক স্বতন্ত্র আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করিবে।

(২) সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ দুই পর্যায়ে নিষ্পন্ন করা যাইবেঃ

(ক) সংসদের আসনসমূহ জনসংখ্যা কোটার ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে বণ্টন; এবং

(খ) উক্তরূপ বন্টনের পর জেলাসমূহে বরাদ্দকৃত সংসদের আসনসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ।

৬। আদমশুমারি প্রতিবেদন ও ইহার প্রয়োগ।- সর্বশেষ আদমশুমারি প্রতিবেদনে জনসংখ্যা বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ হইতে অনূর্ধ্ব বারোমাসের মধ্যে সীমানা পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আদমশুমারি প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বেই যদি নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো তফসিল ঘোষণা করা হইয়া থাকে এবং ঐ সময়সূচি যদি সীমানা নির্ধারণ সময়সূচির সহিত সাংঘর্ষিক হয় তবে ঘোষিত নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পরবর্তী বারো মাসের মধ্যে সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে। আরও শর্ত থাকে যে সর্বশেষ আদমশুমারি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সীমানা পুনঃনির্ধারিত হইবার পর হইতে পরবর্তী আদমশুমারি প্রতিবেদন প্রাপ্তির মধ্যবর্তী সময়কালে কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইলে উহা সর্বশেষ নির্ধারিত সীমানার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে।

৭। জেলা পর্যায়ে আসন বণ্টন।- জেলা পর্যায়ে আসন বণ্টন সংক্রান্ত বিধান বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। বণ্টনকৃত আসনসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ।- (১) সর্বশেষ আদমশুমারি প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে জেলার জন্য বণ্টনকৃত আসনসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হইবে।

(২) সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিটের অখণ্ডতা, প্রশাসনিক সুবিধা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ন রাখার বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। তবে জনসংখ্যা সমন্বয়ের স্বার্থে ক্ষেত্রমত, এক উপজেলা কিংবা থানাধীন সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিটকে অন্য উপজেলা কিংবা থানার সহিত সংযুক্ত করা যাইবে।

৯। আসনসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ ও প্রকাশ।- (১) কমিশন আসনসমূহের সীমানা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পুনঃনির্ধারণের পর প্রতিটি আসনের পুনঃনির্ধারিত সীমানা উল্লেখপূর্বক সরকারী গেজেটে একটি খসড়া তালিকা প্রকাশ করিয়া সংশ্লিষ্ট আসনসমূহের এলাকায় বসবাসকারী জনগনের নিকট হইতে লিখিত আপত্তি ও মতামত কমিশনে পেশ করিবার আহ্বান জানাইবে।

(২) কমিশন প্রাপ্ত মতামত ও আপত্তিসমূহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করিবে। আরও শর্ত থাকে যে উক্তরূপে পুনঃনির্ধারিত সীমানা বিদ্যমান সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ কিংবা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর হইতে কার্যকর হইবে;

১০। পুনঃনির্ধারিত আসনসমূহের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ।- কমিশন প্রাপ্ত আপত্তিসমূহের উপর নির্ধারিত পদ্ধতিতে শুনানি গ্রহণ করিবে। শুনানি শেষে উত্থাপিত বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রাথমিক তালিকায় উল্লিখিত আসনসমূহের সীমানায় প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নপূর্বক বিবেচনাধীন প্রতিটি আসনের সীমানা উল্লেখপূর্বক সরকারি গেজেটে একটি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিবে।

১১। সীমানা পুনঃনির্ধারণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহের বৈধতা।- এই আইনের অধীন কোনো নির্বাচনী এলাকার আসন বণ্টন কিংবা সীমানা নির্ধারণ বা কমিশন কর্তৃক বা কমিশনের কর্তৃত্বাধীনে গৃহীত কোনো কর্মপন্থা বা কৃত কোনো কাজকর্মের বৈধতা সম্বন্ধে কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত করা যাইবে না।

১২। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৩। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) The Delimitation of Constituencies Ordinance, 1976 (Ordinance No XV of 1976) এতদ্বারা বাতিল করা হইল।

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

নিকস/নি-১/জাস/সীঃ নিঃ-১/২০১২/ তারিখ ঃ জানুয়ারি, ২০১২

পরিশিষ্ট ৪

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনঃ সংশোধিত বাজেট ও ব্যয় (২০০৮-০৯ - ২০১২-১৩ অর্থবছর) (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	২০০৮-০৯		২০০৯-১০		২০১০-১১		২০১১-১২		২০১২-১৩	
	সংশোধিত বাজেট	ব্যয়	সংশোধিত বাজেট	ব্যয়	সংশোধিত বাজেট	ব্যয়	সংশোধিত বাজেট	ব্যয়	সংশোধিত বাজেট	ব্যয়
সচিবালয়	১৫,৭৬,৬১	১৪,১৩,০৩	২৭,০৬,৬৮	২৫,৭৯,৮৭	২৮,৮৮,৮৯	৯,৬৯,১০	২১,৪১,২৯		৭৫,৪৯,১৬	
নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৭০,০৫	৫৯,৩৫	৮৯,৮০	৭৪,৬৬	৯০,২৪	৮১,৪৬	৪,৯৫,২৩		৮,৯৭,৭৯	
মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়	২৬,৭৪,৪৭	২৩,২৫,১১	২৯,২৩,৪২	২৬,৭৯,৩৫	৩৪,২৬,২৬	২৯,১৩,৭৬	৪১,৪১,৩৭		৪৫,৫৬,৮৫	
আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা	০	০	০	০	৭০	৭৩	১০০		১০০	
মোট (প্রশাসন)	**৪৩,২১,১৩**	**৩৭,৯৭,৪৯**	**৫৭,১৯,৯০**	**৫৩,৩৩,৮৮**	**৬৪,৯৬,৩৩**	**৩৯,৬৫,০৫**	**৬৭,৭৮,৮৯**		**১৩০,০৪,৮০**	
নির্বাচন ব্যয়	৪১৯,০০,০০	২৯৫,১২,৩৮	৩০০,০০,০০	৩,৯০,৭৭	২৫০,০০,০০	২৩৮,৮১,৩৩	১২৩,০০,০০		৮৩,৩৫,০০	
মোট	**৪৬২,২১,১৩**	**৩৩৩,০৯,৮৭**	**৩৫৭,১৯,৯০**	**৫৭,২৪,৬৫**	**৩১২,২৯,৩৪**	**২৭৮,৪৬,৩৮**	**১৯০,৭৮,৮৯**		**২১৩,৩৯,৮০**	

সূত্রঃ নির্বাচন কমিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আগস্ট ২০১৩।